জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১

প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

উপক্রমণিকা

১.১ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পটভূমি ৩

১.২ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ভিত্তি ৪

১.৩ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ১০

২.১ রূপকল্প ১৪

২.২ অভিলক্ষ্য ১৪

২.৩ শিক্ষাক্রমের এপ্রোচ ১৪

২.৪ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম ১৬

২.৪.১ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা নির্ধারণের প্রেরণা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ১৬

২.৪.২ যোগ্যতার ধারণা ১৭

২.৪.২.১ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ ২০

২.৪.২.২ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি ২১

২.৪.২.৩ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ২১

২.৪.২.৪ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান ২৬

২.৫ মূলনীতি ২৬

২.৬ মূল যোগ্যতা ২৬

২.৭ শিখন-ক্ষেত্র ২৭

২.৮ শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা ২৮

২.৯ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের উদ্দেশ্য ৩০

২.১০ স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়

৩১

২.১০.১ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় ও প্রাথমিক স্তরের নির্বাচিত বিষয়সমূহ

৩২

২.১০.২ মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ থেকে দশম) নির্বাচিত বিষয়সমূহ ৩২

২.১০.৩ শিখন-ক্ষেত্র থেকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য দিক ৩৩

২.১১ বিষয় ও বিষয়ের ধারণায়ণ ৩৪

২.১২ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি) ৬৩

২.১২.১ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় নির্ধারণ ৬৩

২.১২.২ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির আবশ্যিক, নৈর্বাচনিক এবং প্রায়োগিক বিষয়সমূহের প্রকৃতি ও বিন্যাস ৬৪

২.১৩ শিখন সময় ও শিখন সময়ের বিষয়ভিত্তিক বণ্টন ৬৪

২.১৪ শিখন-শেখানো কৌশল ৬৯

২.১৫ শিখন-শেখানো সামগ্রী ৭৩

২.১৬ মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা ৭৪

২.১৬.১ মূল্যায়নের প্রকৃতি ৭৪

২.১৬.২ স্তরভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ৭৬
২.১৬.৩ শিখন মূল্যায়নের মূলনীতি ৭৮
২.১৬.৪ সনদ বা রিপোর্টিং ৭৮
২.১৬.৫ শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন ৭৯
২.১৬.৬ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন ৭৯
২.১৭ শিক্ষাক্রমে ইনক্লুশন ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা ৭৯
২.১৭.১ শিক্ষাক্রমে ইনক্লুশন ৭৯
২.১৭.২ শিক্ষাক্রমে জেন্ডার রূপান্তরমূলক (Transformative) এপ্রোচ ৮২
২.১৮ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ধারার সাথে সমন্বয় ৮৩
২.১৯ মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় ৮৬
২.২০ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও প্রশিক্ষণ ৯১
২.২১ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ৯২
গ্রন্থপঞ্জি I-VI

১.১ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পটভূমি

মানুষ একটি পরিপূর্ণ জীবন প্রত্যাশা করে। সেই জীবন হবে নান্দনিক ও আনন্দময়। পাশাপাশি মানুষ পারিবারিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিজের অর্থপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে চায়। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য জীবনকে নান্দনিক, আনন্দময়, ও অর্থবহ করে তোলা, এবং সেই সাথে শিক্ষার্থীকে জীবিকা অর্জনের উপযোগী যোগ্য, সৃষ্টিশীল ও মানবিক মানুষে পরিণত করা। একইসঙ্গে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীকে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাও শিক্ষার উদ্দেশ্য।

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও জীবিকা বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রযুক্তির উত্তোরোত্তর উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে মানুষের অভিযোজনের কোনো বিকল্প নেই। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে । চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ মানুষের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালীতে যে পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে যন্ত্র ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো নিবিড় হচ্ছে। এর ফলে বর্তমান সময়ের কর্মজগতের অনেক কিছুই ভবিষ্যতে যেমন থাকবে না, তেমনি অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে যা এই মুহূর্তে অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। বিশ্বায়নের কারণে যেমন দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে যাচ্ছে, তেমনি আবার অবিমিশ্র নগরায়ণ, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্দেশিক অভিবাসন আমূল পাল্টে ফেলছে সনাতন জীবন ও সংস্কৃতি। পৃথিবী জুড়েই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটলেও যেমন তার সুষম বণ্টন হয়নি, তেমনি সামাজিক উন্নয়নও তাল মেলাতে পারছেনা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতির সঙ্গে। যার ফলে এখনও পৃথিবীতে রয়ে গেছে ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষার মত মৌলিক সমস্যাবলি। ঘনীভূত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন বা জাতিগত সহিংসতাজনিত সমস্যাসমূহ। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং মাত্রা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং সম্ভাবনার পূর্ণ সুফল গ্রহণের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক এবং যোগ্য বিশ্ব-নাগরিক প্রয়োজন। একবিংশ শতাব্দীর তথ্য ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেরকম নাগরিক তৈরিতে হিমশিম খাচ্ছে সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থা। কারণ এই সনাতন মুখস্থ ও পরীক্ষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল আজ থেকে তিনশত বছর আগের তৎকালীন সমাজের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজন মেটানোর জন্য, এরপর শিক্ষা-কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন হয়েছে খুব কমই। এখন প্রয়োজন এমন শিক্ষাব্যবস্থা, যা নমনীয়, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম এবং উদ্ভূত আর্থসামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন চলমান পুরনো সমস্যার টেকসই সমাধান, আর নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার চেষ্টা ও আত্মবিশ্বাস।

এই সামগ্রিক বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই অভিলক্ষ্য পূরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার শিক্ষা। আর সেজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন অপরিহার্য। আর এই আধুনিকায়নের শুরুটা হতে হবে অবশ্যই একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে যা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন **জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)**-এর একটি নিয়মিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সর্বশেষ ২০১২ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে তাল মিলাতে নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী বিভিন্ন গবেষণা এবং কারিগরী অনুশীলন পরিচালিত হয়। তারই উপর ভিত্তি করে প্রেক্ষাপট, প্রয়োজন এবং নতুন বিশ্বপরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.২ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ভিত্তি

নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি ভিত্তিকে বিবেচনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

- দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation)
- মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological foundation)
- ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historic foundation)
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার (Global and national priorities) এবং
- প্রমাণনির্ভর ভিত্তি (Evidence based Foundation)

দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation)

শিক্ষাক্রমের একটি দার্শনিক ভিত্তি থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত দার্শনিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক তত্ত্ব বিশে-ষণ করে সেগুলোর ভিত্তিতে নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। যুগের পরিক্রমায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রথাগত অনেক দার্শনিক মতবাদ (যেমন- Perennialism, Essentialism, ইত্যাদি) প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে প্রগতিবাদ (Progressivism) কে এই শিক্ষাক্রমে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো দৈনন্দিন জীবন এবং সমস্যা নিয়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা। এই বিবেচনায় শিক্ষার্থীর শিখন হতে হবে আন্তঃবিষয়ক (interdisciplinary), সমন্বিত (integrative) এবং প্রক্রিয়া হবে মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive)। শিক্ষাবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হল গঠনবাদ এবং পুনর্গঠনবাদ। গঠনবাদ অনুযায়ী শিখনের মূল উদ্দেশ্য হল পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে অভিযোজনের জন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করা। আর পুনর্গঠনবাদের (Re-constructivism) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থী অভিযোজনের জন্য সামাজিক শিখন পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়া ঘটায় এবং এর ফলে শিক্ষার্থী ও শিখন পরিবেশ উভয়ের মাঝেই পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের এই অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থীর শিখনের ভিত্তি তৈরি করে। প্রগতিবাদ এবং পুনর্গঠনবাদকে মূল দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখার কাঠামো ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য মতবাদের প্রাসঙ্গিক ধারণাসমূহ প্রগতিবাদ এবং পুনর্গঠনবাদের আলোকে রূপান্তর ঘটিয়ে এই শিক্ষাক্রমে বিবেচনা করা হয়েছে।

মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological foundation)

শিক্ষাক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধরন কেমন হবে তার নির্দেশনা প্রদান করে। এই ভিত্তিটি তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের শিখন মতবাদের ধারণাসমূহ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। আচরণবাদী (Behaviourist) মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিখন একটি ধারাবাহিক পূর্ব নির্ধারিত প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ধাপে ধাপে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করতে হবে। অপর দিকে বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশ তত্ত্বের (Cognitive Development Theory) অনুসারী মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন শিখন নির্ভর করে শিক্ষার্থীর তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ এবং চিন্তন প্রক্রিয়ার চর্চার ওপর। কাজেই এই মতবাদ অনুযায়ী শিখন-প্রক্রিয়া লুকিয়ে আছে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি সমস্যা সমাধানমূলক চর্চার ওপর যা চিন্তন প্রক্রিয়াকে স্বজ্ঞাত, সৃষ্টিশীল এবং প্রতিফলনমূলক উপায়ে চর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অপরদিকে সামগ্রিকতাবাদে (Gastalt Theory) বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিখন নির্ভর করে সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের পথ বের করার ওপর, এই প্রক্রিয়ায় সমস্যার চারপাশের পরিবেশের উপাদান ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ অতীব জরুরি একটি প্রক্রিয়া। কাজেই সামগ্রিকতাবাদ অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন নিশ্চিত করতে পারলেই প্রকৃত শিখন ঘটে। এই সামগ্রিকতাবাদের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে সামাজিক গঠনবাদ (Social Constructivism) নামে একটি নতুন মনোবৈজ্ঞানিক ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। এই মতবাদ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের জন্য উপযোগী পরিবেশ এবং পারস্পরিক যোগাযোগ তৈরির মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সমাধান বের করার কৌশল নির্ধারণকে উৎসাহিত করে। পরিবেশ ও প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যে সহাবস্থান তার ওপরে ভিত্তি করে মানুষের শিখন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে আরেকটি মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে, যা ব্রর্নফ্রেনব্রেনারের ইকলজিকাল সিস্টেম থিওরি (Ecological System Theory) নামে পরিচিত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ডিজিটাল টেকনোলজি প্রয়োগের ফলে মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিনির্ভর স্বাধীনতা (শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও প্রেষণা অনুযায়ী শিখনের সময়, বিষয়বস্তু, শিখনের স্থান, উদ্দেশ্য ও শিখনের প্রক্রিয়াতে বহুমাত্রিক নমনীয়তা নিশ্চিত করা) এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করার ভিত্তিতে এক নতুন শিখন ধারণার উদ্ভব ঘটেছে, যা সংযোগবাদ (Connectivism) নামে পরিচিত (Siemens, 2004)। এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় সামাজিক গঠনবাদ মতবাদ এবং এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মতবাদসমূহকে মূল মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং এর সঙ্গে Howard Gardner (১৯৮৩)-এর বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার তত্ত্ব (Multiple Intelligence Theory) যা সামাজিক গঠনবাদের ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠেছে; এবং যা ধারণা দেয় যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তার বহুমুখী মাত্রা রয়েছে এবং একজন মানুষ এক বা একাধিক মাত্রার বুদ্ধিমত্তায় পারদর্শী হতে পারে, তাও এখানে বিবেচিত হয়েছে। সর্বোপরি এই রূপরেখায় প্রয়োজনভেদে অন্যান্য মতবাদেরও সীমিত ও যৌক্তিক চর্চা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historic foundation)

এ উপমহাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন গড়ে উঠে ১৮৮২ সালে Sir William Wilson Hunter এর নেতৃত্বে যা হান্টার কমিশন নামে পরিচিতি লাভ করে। হান্টার কমিশন ১৮৮৩ সালে তার রিপোর্টে সর্বপ্রথম কোর্স এ (সাহিত্য) ও কোর্স বি (কারিগরি শিক্ষা) নামে দু'টি ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রস্তাব করে। এর মাধ্যম ব্রিটিশ ভারতে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তা বহাল থাকে। ১৯৪৯ সালে গঠিত মওলানা আকরাম খান শিক্ষা কমিটি'র রিপোর্ট অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার একটি সার্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতন করতে চেয়েছিল (Islam, S., 2012)। ১৯৫৭

সালে আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনও তার রিপোর্টে একই ধারার শিক্ষার কথা বলে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করার পর শরীফ খান শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং ১৯৫৯ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় নবম শ্রেণি থেকে সাধারণ শিক্ষাকে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা নামে তিনটি ধারায় বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় (Department of Education, Government of Pakistan, 1959)। আজ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। তবে স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে এই শিক্ষা কমিশন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, তিনি এমন একটি শিক্ষাকাঠামো চান যার মাধ্যমে একটি সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে যার ভিত্তি হবে সমতা। তাঁর দিক নির্দেশনা অনুযায়ীই এই কমিশন ১৯৭৪ সালে সার্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারার সাধারণ শিক্ষার কথা সুপারিশ করেছিল (Government of the People's Republic of Bangladesh, 1974) । এই শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি ঐতিহাসিক এ প্রেক্ষাপট ও নির্দেশনাকে সামনে রেখে উন্নয়ন করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ৪: *সকলের জন্য একীভূত ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি*

লক্ষমাত্রাসমুহঃ

৪.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা

৪.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা

৪.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা

৪.৪ চাকুরী ও শোভন কর্মে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো

বৈশ্বিক ও জাতীয় অগ্রাধিকার (Global and national context and priorities):

আজকের পৃথিবী যেসব সমস্যা ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, সেসব সমস্যার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং সম্ভাবনার পূর্ণ সুফল গ্রহণের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজনক্ষম মানবিকতাবোধসম্পন্ন যোগ্য বিশ্ব-নাগরিক দরকার। এখন প্রয়োজন এমন সৃষ্টিশীল অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা, যা নমনীয়, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম এবং উদ্ভূত আর্থসামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে একটি উন্নত সমাজ গঠনের, যার প্রতিফলন ঘটেছে নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারে। বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সকল নাগরিকের জন্য সার্বজনীন মানসম্মত শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাতেও "সকলের জন্য একীভূত ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা

ীকার ব্যক্ত হয়েছে। বর্তমান সরকারের

৪.৫ অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষের বৈষম্যের অবসান ঘটানো

৪.৬ নারী পুরুষ নির্বিশেষে যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা

৪.৭ অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বিশ্বনাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা

৪.ক শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, একীভূত ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা

৪.খ উন্নত দেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংশি-ষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচীসহ উচ্চশিক্ষায় ভর্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রদেয় বৃত্তির সংখ্যা বৈশ্বিকভাবে ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো

৪.গ শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা

নির্বাচনী ইশতেহার এবং অষ্টম পাঁচশালা পরিকল্পনাতেও একই অঙ্গীকারের প্রতিফলন বিদ্যমান। এছাড়াও সরকারের ভিশন ২০২১, ২০৪১, ২০৭১ এবং ২১০০ (ডেল্টাপ্ল্যান) প্রভৃতি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য একটি যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম রূপরেখা উন্নয়ন জরুরি। বাংলাদেশকে তার বিশাল জনগোষ্ঠীর জনমিতিক সুফল পেতে হলে এ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর সেজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের শুরুটা হতে হবে অবশ্যই একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে যা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

বিশ্বনাগরিকত্ব (Global Citizenship)

বিশ্বনাগরিকত্ব বলতে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ বোঝায় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল, একীভূত, সুরক্ষিত এবং টেকসই বিশ্ব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ হয়। শিক্ষাক্রমে বিশ্বনাগরিকত্বকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা স্থানীয়, জাতীয়, ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অবগত হয়ে বিভিন্ন দেশ ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কে অবগত হয়; এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা, সংহতি ও শ্রদ্ধাবোধ ধারণ করার মাধ্যমে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার মানসিকতা অর্জন করে।

প্রমাণনির্ভর ভিত্তি (Evidence based Foundation):

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন অনুসৃত মডেল পর্যবেক্ষণ করে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রচলনের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই বিশ্লেষণটিই শিক্ষাক্রম রূপরেখার প্রমাণ নির্ভর ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা OECD (২০১৮)-এর Learning Framework 2030-র বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভালো থাকার জন্য শিখনের কিছু সাধারণ অংশীদারিত্বমূলক লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। তেমনি বৈশ্বিক সমস্যা সমাধান ও অনিশ্চিত পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজন প্রাসঙ্গিক জ্ঞান-দক্ষতা-দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন । এগুলো নিশ্চিত করার জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের কোন বিকল্প নেই। OECD (২০১৮) রিপোর্ট অনুযায়ী এই যোগ্যতার ধারণা গতানুগতিক জ্ঞান-দক্ষতা-দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবেনা, বরং যোগ্যতা হতে হবে রূপান্তরমূলক (Transformative)। রূপান্তরমূলক যোগ্যতা (Transformative Competencies) অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিশীলতা, দায়িত্বশীলতা ও সচেতনতা চর্চার মাধ্যমে নতুন মূল্যবোধ তৈরিতে, ও সমস্যা সমাধানে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। Brookings Report (2016) on Skills for a Changing World পৃথিবীর ১০২টি দেশের শিক্ষানীতি ও নির্দেশনা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দেশ তাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য কী কী ধরনের দক্ষতা অর্জনের সুপারিশ করেছে তা বের করার চেষ্টা করেছে। এই গবেষণা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শিক্ষাক্রম রূপান্তর প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে যোগ্যতানির্ভর এবং আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে ভবিষ্যৎ দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের একটা ধারা সুচিত হয়েছে। গবেষণায় ১০২টি দেশের নীতি, নির্দেশনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৭৬ টি দেশে সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাকে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৩৬টি দেশের নীতি নির্দেশনায় এর রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যে দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ১০২টি দেশের মধ্যে ৫১টি দেশের শিক্ষাক্রম সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতাভিত্তিক । এরমধ্যে ১১টি

দেশ বিষয় এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতাকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এই ফলাফল থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবী সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষতাভিত্তিক অর্থাৎ, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯৯২ সালে প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম সূচনা করা হয়। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে যোগ্যতার নতুন নতুন ধারণা তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান শিক্ষাক্রমে উক্ত ধারণাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশে সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। প্রচলিত এই শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্তরভিত্তিতে পৃথক উদ্যোগে এই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছিল, ফলে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রণীত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বপরিস্থিতিতে যোগ্যতা নিয়ে টিকে থাকতে এবং আত্মপরিচয় সমুন্নত রেখে উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরির লক্ষ্যে নতুনভাবে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় ও প্রাথমিক স্তরের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণ ও প্রচলিত শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ শীর্ষক সমীক্ষার (NCTB, 2019) উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসমূহতে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সুষম প্রতিফলন নিশ্চিত করা দরকার।
- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে ক্রস কাটিং বিষয়ের প্রতিফলন নিশ্চিত করা জরুরি।
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে সুদক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন যারা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পাঠদান ও যৌক্তিকভাবে মূল্যায়নে সক্ষম।
- বিষয়ভিত্তিক সময় বণ্টন সুষম হওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষাক্রমে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক বিষয় (যেমন, ডিজিটাল টেকনোলজি) ও যোগ্যতাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে।
- শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক গঠনবাদনির্ভর, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, একীভূত শিক্ষার কৌশলের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণে যে গবেষণা পরিচালিত হয় (NCTB, 2019) তার আলোকে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য মাধ্যমিক স্তরেও যোগ্যতাভিত্তিক (Competency Based) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষাক্রমও এক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।
- শিক্ষাক্রম পরিমার্জন/নবায়ন করে মনোপেশিজ ও আবেগিক ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।
- প্রাক-বৃত্তিমূলক ও বৃত্তিমূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।
- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অর্জনযোগ্য যোগ্যতা ও শিখনফল এমনভাবে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন যাতে SDG, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ ও রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

- বিজ্ঞান, টেকসই উন্নয়ন, মানবাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে/নবায়নে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- শিখন অনেক বেশি কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Activity and experiential learning based) হওয়া প্রয়োজন।

সার্বিকভাবে বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমের বর্তমান পরিমার্জন ও উন্নয়নের ফলে যে গুণগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো:

- প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষাক্রম সমন্বিতভাবে পরিমার্জনের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপাশি এই প্রথম শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রূপান্তরযোগ্য যোগ্যতার স্তর অনুযায়ী জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ যথাযথ অর্জনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
- গবেষণালব্ধ তথ্য এবং যৌক্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বাড়তি চাপ কমানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই ক্ষেত্রে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে আন্তঃবিষয়ক (interdisciplinary), সমন্বিত (integrative), মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) অভিজ্ঞতাভিত্তিক করে শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তুর ভার কমানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।|
- বৈশ্বিক পরিবর্তন এবং বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য সামনে রেখে ৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুকিশোরদের একীভূত, সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিতভাবে প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে একটি অবিচ্ছিন্ন কাঠামোতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করার বহুল প্রচলিত ধাপ রয়েছে। এনসিটিবি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে এই ধাপগুলো অনুসরণ করে থাকে। ধাপসমূহ হলো:

ধাপ ১- গবেষণা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং চাহিদা নিরূপণ

শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে প্রচলিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রচলিত শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপনের উদ্দেশ্যে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী বিস্তৃত পরিসরে চারটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশে-ষণ ও চাহিদা নিরূপণের জন্য বিভিন্ন কারিগরি কর্মশালা, ইস্যুভিত্তিক আলোচনা ইত্যাদি পরিচালিত হয়। উক্ত গবেষণাসমূহে সরকারের লক্ষ্য, পরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পর্যালোচনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রম, তথ্য ও দলিল ইত্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। এসকল গবেষণার সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাক্রম কেমন হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

ধাপ ২- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা উন্নয়ন

প্রচলিত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের ভিত্তি, গঠন ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। উল্লিখিত গবেষণাসমূহে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রমের ভিন্ন ভিন্ন এপ্রোচের পরিবর্তে একই এপ্রোচে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের সাম্প্রতিক ধারণা বিবেচনায় নিয়ে প্রাক–প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রাক–প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটি নিরবিচ্ছিন্ন (seamless) শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার পরিকল্পনা করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক এই জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটি (Curriculum Development and Revision Core Committee- CDRCC) গঠন করা হয়।

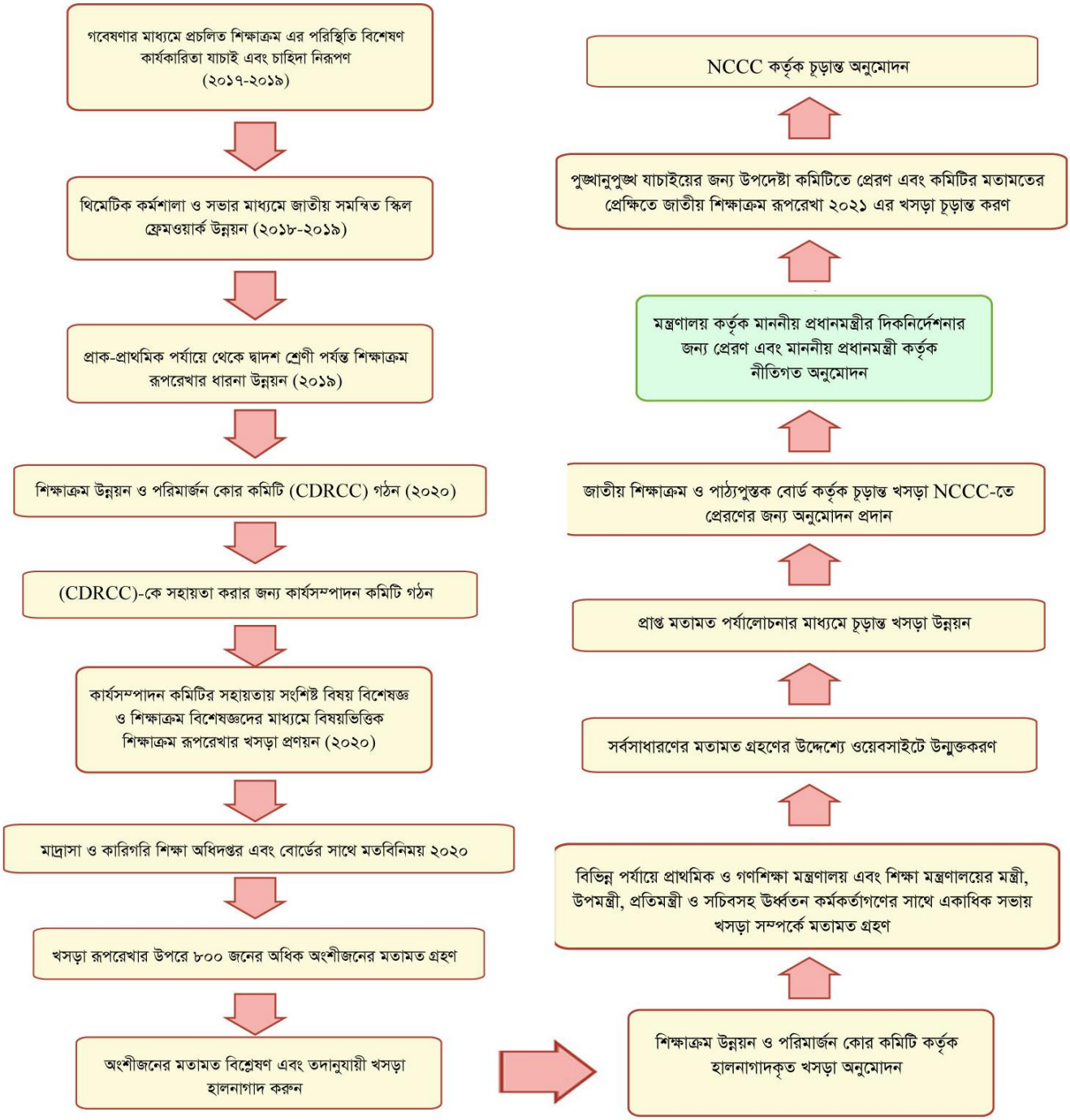

দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে সিডিআরসিসির পরামর্শক্রমে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবির কর্মকর্তা এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি কার্যসম্পাদন কমিটি (Working committee) গঠন করা হয়। এই কমিটি জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা উন্নয়নে কারিগরি ও নিয়মতান্ত্রিক কাজসমূহ সম্পাদনসহ সিডিআরসিসিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

কার্যসম্পাদন কমিটি একাধিক কর্মশালা ও সভার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার উপর একটি ধারণা প্রণয়ন করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীসহ দুই

মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় উক্ত ধারণা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটি সিমলেস বা নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা উন্নয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

তদানুযায়ী সিডিআরসিসির তত্ত্বাবধানে কার্যসম্পাদন কমিটি বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণি শিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞগণকে নিয়ে একাধিক কর্মশালা ও কারিগরি সভার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। সিডিআরসিসি ও কার্যসম্পাদন কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের প্রত্যক্ষ নিদের্শনায় ও অন্যান্য নীতি নির্ধারকদের পরামর্শে ১৫টির বেশি কারিগরি কর্মশালা ও শতাধিক ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে ৩৩টি সংস্থার ১৫৬ জন বিশেষজ্ঞের সরাসরি অংশগ্রহণে এ শিক্ষাক্রম রূপরেখার প্রথম খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

এই ধারাবাহিকতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞগণের সরাসরি পরিচালনায় ১৩টি দলের মাধ্যমে খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখার উপর ৮০০-এর অধিক অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হয়। অংশীজনদের মধ্যে রয়েছেন নীতি নির্ধারক (মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণ, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ); প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ; শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা (বেসরকারি উদ্যোক্তা); শিক্ষা বিশেষজ্ঞ (বিজ্ঞান শিক্ষা, গণিত শিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, একীভূত শিক্ষা), শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক প্রশিক্ষক (নায়েম, নেপ, এইচএসটিটিআই, পিটিআই, টিটিসি, টিটিটিসি, বিএমটিটিআই); অভিভাবক (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক); শিক্ষক (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, শিক্ষা); শিক্ষার্থী (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, শিক্ষা); বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক (বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, কারিগরি, মেডিকেল, প্রকৌশল, কৃষি, পরিবেশ, সামাজিক বিজ্ঞান); পেশাজীবী (প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিদ, পরিবেশবিদ, উন্নয়ন কর্মী); নিয়োগকর্তা (ইন্ডাস্ট্রি, পিএসসি, এনজিও, উদ্যোক্তা, মানবসম্পদ বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সেক্টর - আইসিটি, কৃষি, গার্মেন্টস, গণমাধ্যম, সৃজনশীল মিডিয়া); মাদ্রাসা (শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ); কারিগরি (শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ); এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সদস্য। অংশীজন পরামর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট মতামতগুলোর যথাযথ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে পরবর্তীকালে খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি পরিমার্জন করা হয়।

এ পর্যায়ে খসড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি ১৩.০১.২০২০ তারিখে সিডিআরসিসি সভায় উপস্থাপন করা হয় যা কমিটি কর্তৃক পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য অনুমোদন করা হয়। সিডিআরসিসি'র সুপারিশ অনুযায়ী সর্বসাধারণের মতামতের উদ্দেশ্যে খসড়া রূপরেখাটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ খসড়া রূপরেখাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

২৭.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এনসিটিবির ৬৮৪ তম জরুরি বোর্ড সভার ০১ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়।

এমতাবস্থায়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা কামনা করেন। তদানুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার একটি সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

১৩.৯.২০২১ তারিখ একটি ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা উপস্থাপনা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উপস্থাপিত জাতীয়

শিক্ষাক্রম রূপরেখার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই সভার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

১২ অক্টোবর ২০২১ তারিখ জাতীয় শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির সভায় জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি উপস্থাপন করা হলে কমিটি কিছু সুপারিশসহ পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য অনুমোদন প্রদান করে।

এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়।

অনুমোদিত শিক্ষাক্রম রূপরেখার আলোকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী ধাপে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে শ্রেণি এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন করা হবে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম যৌক্তিকীকরণ, চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদনের পরে বিষয়-বিশেষজ্ঞগণ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে চূড়ান্ত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও সামগ্রী প্রণয়নের কাজ শুরু করবেন।

২.১ রূপকল্প (Vision)

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা।'

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি লালনকারী সৎ, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক, আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ, সৃজনশীল ও সুখী একটি প্রজন্ম তৈরির লক্ষ্যে রূপকল্পটি নির্ধারিত হয়েছে। এই রূপকল্পে এমন একটি প্রজন্মের স্বপ্ন দেখা হয়েছে, যারা স্বকীয়তা বজায় রেখে অপরের কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সচেষ্ট হবে। একইসঙ্গে সৃজনশীলতা ও রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে স্বাধীনতার সুফল নিশ্চিত করে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখতে পারবে। এছাড়াও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয়ের বহুমাত্রিকতাকে স্বাগত জানিয়ে অভিযোজনে সক্ষম বিশ্বনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে।

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প অর্জনে প্রয়োজন সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কিছু কৌশলগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন। একটি কার্যকর পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই এ রূপকল্প অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। রূপকল্প বাস্তবায়নের অভিলক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ-

- সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ সৃষ্টি ও স্বীকৃতি প্রদান
- সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি নিয়োগ

২.৩ শিক্ষাক্রমের অ্যাপ্রোচ (Approach of the Curriculum)

বাংলাদেশের শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় অভিষেক ঘটে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তির মাধ্যমে। এখান থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করে একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করে বা কর্মজীবনে প্রবেশ করে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কী কী যোগ্যতা অর্জন করলে শিক্ষার্থীরা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে সেগুলোকে বিবেচনার কেন্দ্রে রেখে প্রাক-প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের যথাযথ উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ ধারণায়ন (conceptualization) বা ধারণা তৈরি করা জরুরি।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য, কৌশল ও গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে এবং অনুধাবন করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এ সংক্রান্ত বৈশ্বিক সংজ্ঞার্থ এবং দেশীয় পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাকে নিম্নলিখিতভাবে ধারণায়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারণাকে যেভাবে দেখা হয়েছে:

শিখন পরিবেশ:	যেখানে শিক্ষার্থী নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে শিখন অভিজ্ঞতা এবং উপায় অনুসন্ধানের মাধ্যমে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করে এবং নিজের মতো তার প্রয়োগ ও প্রদর্শন করে প্রতিনিয়ত ক্ষমতায়িত হতে পারে।
শিখন সহায়তা:	যেখানে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব শিখন চাহিদা অনুযায়ী সময়মত পৃথক বা সমন্বিত সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে কার্যকরী শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করতে পারে।
শিখন অংশগ্রহণ:	যেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিভিন্ন পথে এবং ভিন্ন ভিন্ন গতিতে শিখতে পারে।
শিখন অগ্রগতি:	যেখানে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ভিত্তি তার পারদর্শিতার রেকর্ড, শিখন সময় বা অংশগ্রহণের ধরন নয়।
শিখন মূল্যায়ন:	যেখানে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর জন্য ইতিবাচক ও অর্থপূর্ণ শিখন অভিজ্ঞতা যা সময়মতো শিখন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমভিত্তিক পারদর্শিতার প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।
শিখন সমতা:	যেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্রম ও তার বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের মধ্যে নিবিড়ভাবে বিদ্যমান থাকে।
শিখন প্রত্যাশা:	স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট, পরিমাপ ও রূপান্তরযোগ্য।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের অনুঘটকসমূহ :

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়...

- প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় শিখন পরিবেশ ও সহায়তা পায় এবং অর্জিত যোগ্যতাসমূহ বাস্তব সমস্যা সমাধানে কাজে লাগানোর সুযোগ পায়।
- নিরাপদ ও নিজস্ব শিখন পরিবেশে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সর্বোচ্চ চেষ্টার সুযোগ পায়।
- এখানে সকলের সংস্কৃতি ও মতামতের মূল্য দেয়ার ফলে শিক্ষার্থীর শিখনে দায়বদ্ধতা তৈরি হয়।
- এখানে সে এমন যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ ও সহায়তা পায় যা তাকে স্বাধীনভাবে শিখনে উদ্বুদ্ধ করে।
- এখানে সমন্বিতভাবে যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থী তার প্রযোজন অনুযায়ী যেকোনো স্থানে এবং যেকোনো সময়ে শেখার সুযোগ পায়, পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে এবং নিজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থী তার অগ্রগতি নিয়ে সময়মতো নির্দেশনা, সহায়তা ও ফলাবর্তন পায়।
- শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে মনোসামাজিক সহায়তা পায় যা তাকে শেখার ব্যক্তিগত পথ তৈরিতে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন হয় শিখন যোগ্যতা ও পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে এবং এর উদ্দেশ্য হল শিখন যোগ্যতা অর্জন করতে শিক্ষার্থীকে কোথায় কীভাবে কাজ করতে হবে তা জানার জন্য।
- শিক্ষার্থী পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়ে পরবর্তী ধাপের শিখনে অগ্রসর হতে পারে।

- শিক্ষাব্যবস্থা, কাঠামো, শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো কৌশল ও মূল্যায়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তাই সমন্বিত পরিবর্তন ও বাস্তবায়ন করা যেন কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়।
- সমতা বজায় রেখে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন যেন শিখন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার মধ্য দিয়ে **সকল শিক্ষার্থী** পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশে শিখতে পারে।

- শিক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা অনুযায়ী যেন সকল শিক্ষার্থী শিখতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং বাধাঁপ্রাপ্ত হলেও আবার নিজের মত করে আত্মবিশ্বাস নিয়ে শিখন-যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এরূপ ব্যবস্থা রাখা।
- শিখন-চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভাবনী ও কার্যকরী শিখন-পরিবেশ তৈরি করা যেন শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো বিভিন্ন উপায়, প্রক্রিয়া ও সময় ব্যবহার করে শিখতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন-যোগ্যতা যেন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা রাখা।
- শিখন যেকোনো সময়ে যেকোনো স্থানে অর্জিত হতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- শিখন সহযোগিতামূলক এবং সামাজিকভাবে গ্রথিত করা যেন তা অনেক বেশি গভীর হয় ।

শিক্ষা থেকে প্রত্যাশা স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য করা যেন উন্নত-শিখন সংস্কৃতি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়।

২.৪ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

২.৪.১ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা নির্ধারণের প্রেরণা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

চেতনা হলো আবেগিক ও সামাজিক বুদ্ধিমত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট, সময় ও পরিস্থিতিতে ব্যক্তিক মূল্যবোধ, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা, গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সমন্বয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আচরণ করতে প্রেরণা যোগায়। সেই আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শিক্ষাক্রম রূপরেখার সকল ধারণা নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রমের মূল ভিত্তি হলো মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত চেতনা ও স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি।

এই শিক্ষাক্রম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তার মূল ভিত্তিসমূহকে নিম্নবর্ণিতভাবে ধারণ করেছে:

মানবিক মর্যাদা: মানবিক মর্যাদা হচ্ছে প্রতিটি মানুষের সম্মান এবং আত্মমর্যাদা যা স্থান, কাল, পরিস্থিতিভেদেও অক্ষুণ্ন থাকে। মানবিক মর্যাদা মানবাধিকারের মূল ভিত্তি যার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব এবং যা কোনোভাবেই স্থগিত করা যায় না। প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম সম্মান এবং মর্যাদা নিশ্চিত করা মুক্তিযুদ্ধের চেতনালব্ধ অঙ্গীকার।

সামাজিক ন্যায়বিচার: মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে মানবাধিকার, সংবিধান, আইন, ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সামাজিক সহাবস্থান নিশ্চিত করাই সামাজিক ন্যায়বিচার। শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার।

সাম্য: ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিনির্বিশেষে সবাইকে সম্মান ও গ্রহণ করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রেক্ষিত বিবেচনায় সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা এবং তা বজায় রাখাই হচ্ছে সাম্য।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিম্নবর্ণিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; [১]

[1] তথ্যসূত্র http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957.html, accessed on May 09, 2022

৮। [(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।]

জাতীয়তাবাদ

[৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।]

সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি

[১০।মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।]

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

[১১/প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ১২[* *] ১৩[এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে]/*

ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

[১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য
(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,
(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,
(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,
(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।]

ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে অনুপ্রাণিত উদ্যোগী ও উৎপাদনক্ষম জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করা প্রয়োজন। একইসাথে আত্মপরিচয় বহাল রেখে অভিযোজনে সক্ষম বিশ্বনাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করার জন্যও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষাক্রম রূপরেখায় যোগ্যতার বিভিন্ন উপাদানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২.৪.২ যোগ্যতার ধারণা

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করছে। বাংলাদেশেও শিক্ষাক্রম রূপরেখাটি যোগ্যতার ধারণাকে কেন্দ্র করেই উন্নয়ন করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গাড়ি কীভাবে চালনা করতে হয় তা যখন বই পড়ে বা শুনে বা দেখে একজন শিক্ষার্থী জানতে পারে, তার জ্ঞান অর্জিত হয়। ঐ শিক্ষার্থী যদি গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলো হাতে-কলমে পরিচালনা করতে শেখে অর্থাৎ গাড়ি সামনে, পেছনে, ডানে বা বামে চালাতে পারে কিংবা ব্রেক করতে পারে, তবে তার দক্ষতা তৈরি হয়। আর যদি সে গাড়ি চালিয়ে নিজের ও রাস্তার সকল মানুষ, প্রাণী ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করে গন্তব্যে পৌঁছানোর সক্ষমতা অর্জন করে, তবে ঐ শিক্ষার্থীর গাড়ি চালনা বিষয়ে যোগ্যতা অর্জিত হয়। এখানে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা জনপ্রিয়তা পেলেও 'যোগ্যতা'র সুনির্দিষ্ট বা একক

কোনো তত্ত্ব বা সংজ্ঞার্থ গড়ে ওঠেনি যার মাধ্যমে প্রচলিত সকল ধারণাকে একটি অভিন্ন ফ্রেমে বাঁধা যায় (Winterton et al., 2005)। প্রেক্ষাপট যোগ্যতার ধারণাকে প্রভাবিত করে বলেই বিভিন্ন দেশের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আবার শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, কিংবা বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে (Kennedy D & Hyland A, 2009)। এমনকি নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য, কেননা কোনো শিক্ষাবিদ বা গবেষক 'যোগ্যতা' বোঝাতে ব্যবহার করেছেন সক্ষমতা, আবার অনেকেই ব্যবহার করেছেন দক্ষতা বা Capacity, Capability, Performance Standard ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে খুবই সংকীর্ণ অর্থে, অর্থাৎ, যোগ্যতা আর দক্ষতাকে প্রায় সমার্থক করে দেখা হয়েছে। (Adam 2004, Brown and Knight 1995)। অন্যদিকে ECTS (Europian Credit Transfer System) Users' Guide 2009 সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনে শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পদ্ধতিগত সক্ষমতা প্রয়োগের প্রমাণিত ক্ষমতাই যোগ্যতা। নার্সিং পেশায় সেবা দেয়ার সময় জ্ঞানমূলক, আবেগীয় ও মনোপেশিজ দক্ষতাসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারাই যোগ্যতার পরিচায়ক (Miller et al, 1988)। পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা হলো জ্ঞান, মনোভাব এবং আচরণের এমন এক প্যাটার্ন যা একত্রে কোনো কাজ সম্পাদনের সামর্থ্য তৈরি করে (Neary, 2002)। শুধু জ্ঞান আর দক্ষতা নয় বরং মূল্যবোধ, সূক্ষ্ম চিন্তন, পেশাগত বিচার-বিবেচনা, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সন্নিবেশনও অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত।

একইভাবে দেশভেদেও যোগ্যতার ধারণায় পার্থক্য দেখা যায়। The Higher Education and Training Awards Council of Ireland (HETAC)-এর মতে, বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে জ্ঞান ও দক্ষতার সৃজনশীল ও কার্যকর প্রদর্শন এবং প্রয়োগ করতে পারাকেই যোগ্যতা বলে। এ কাউন্সিল আরো মনে করে যে, শিক্ষার্থীর নিজের দুর্বলতা নিজেই চিহ্নিত করতে পারা এবং সে অনুযায়ী নতুন কিছু শিখতে পারাও যোগ্যতা। ২০০০ সালে Tuning Educational Structures in Europe নামক প্রকল্প ইউরোপের শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যতার সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে, যোগ্যতা হচ্ছে জ্ঞান, অনুধাবন, দক্ষতা এবং সক্ষমতার এক সমন্বয়। আবার ইংল্যান্ডে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে কর্মসম্পাদন ও পেশাগত ভূমিকা পালনের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ্যতা বলতে দক্ষতা, জ্ঞান ও ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন : প্রবণতা, মনোভাব, আত্ম-ধারণা প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে (Van der Klink and Boon, 2002)। অস্ট্রেলিয়ান শিক্ষাক্রমে যোগ্যতাকে উল্লেখ করা হয়েছে 'Capability' হিসেবে। এই শিক্ষাক্রমে ধরে নেয়া হয়েছে জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ আর স্বভাব বা অন্তর্গত বিন্যাস (Dispositions)-এর সম্মিলনে গড়ে ওঠে যোগ্যতা। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন জটিল ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কার্যকর ও যথার্থভাবে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে তখন যোগ্যতা অর্জন করে। জার্মানিতে যোগ্যতাকে গ্রহণ করা হয়েছে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য অর্জিত জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস করার সক্ষমতাকে। অন্যদিকে, এস্তোনিয়া তার শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার সাধারণ ধারণাকে (অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি, এবং মূল্যবোধ-সংস্কৃতি) নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গ্রহণ করেছে (Estonia, 2014)।

ভিন্ন ভিন্ন ধারণায়নের মধ্যেও যোগ্যতা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, তা হলো, শিক্ষার্থী যদি কোন প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা প্রভৃতির সন্নিবেশ ঘটিয়ে কর্মসম্পাদনে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে তবে তাকে ঐ বিশেষ প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ বলা যায় (Kennedy D & Hyland A, 2009)। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে যে ধারণাটি

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নিজস্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনা। কেননা শিক্ষার্থীদেরকে নিজস্ব প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযুক্ত করা না হলে তাদের মধ্যে যেকোনো যোগ্যতা গড়ে তোলাই দুরূহ হয়ে যেতে পারে (Klieme E. et al. 2008)।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, যোগ্যতার ধারণাসমূহের ভেতর কিছু উপাদান সার্বজনীন; যেমন : জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি, আবার কিছু উপাদান বিভিন্ন দেশ নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সংযুক্ত করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যোগ্যতাকে চারটি উপাদানের সমন্বয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সেগুলো হলো: **মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা** ও **জ্ঞান**।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতাকে এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিবৃত উপাদানগুলোর আন্তঃসম্পর্ক সরলরৈখিক নয় বরং জটিল বহুমাত্রিক[২]।

যোগ্যতার সংজ্ঞা

উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যোগ্যতা হলো **মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা।**

যোগ্যতার ধারণার আলোকে তার উপাদানসমূহকেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেন তা ভালোভাবে উপলব্ধি করে শিক্ষাক্রমের মূল যোগ্যতা, শিখনক্রম, শিখন-শেখানো কৌশল, শিখন-শেখানো সামগ্রী ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রতিফলিত করা যায়।

২.৪.২.১ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হচ্ছে এক ধরনের নীতি বা বিশ্বাস (Guiding principles/beleifs) যা যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত, সমাধান বা অগ্রাধিকার নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের দীর্ঘ দিনের চর্চার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে যা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়। জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের সঙ্গেও মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে

---

[2] মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে তার সক্ষমতা বা যোগ্যতায় রূপান্তরিত হয় এবং এই উপাদানগুলো আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে কীভাবে আচরণের দ্বারা প্রকাশ পায়, এই বিষয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ও মানব উন্নয়নে বহুল ব্যবহৃত একটি তত্ত্ব (The theory of planned behavior-**Icek Ajzen, 1991**) প্রচলিত আছে। মানুষের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (যেমনঃ বয়স, লিঙ্গ) নির্বিশেষে অর্জিত জ্ঞান (Knowledge) ও এর প্রয়োগ অভিজ্ঞতা (Application Experience) তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটায়:

১. সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সুনির্দিষ্ট আচরণ করার দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude) তৈরি করে;
২. নিজের কাজ করা বা সমস্যা সমাধানের সক্ষমতার ওপরে আত্মবিশ্বাস (Self-efficacy Belief) প্রস্তুত করে
৩. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত আদর্শ (Norm) বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তার মাঝে মূল্যবোধ ও আদর্শগত বিশ্বাস (Normative Belief) তৈরি হয়।

জ্ঞান ও প্রয়োগ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি এই তিনটি উপাদানের মাঝে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে মানুষের মাঝে পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক আচরণ প্রকাশের সামষ্টিক বিশ্বাস তৈরি হয় এবং তা সঠিকভাবে প্রয়োগের চর্চা করার সক্ষমতাও পরিলক্ষিত হয়।

জড়িত এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও বিদ্যমান। ধরন অনুযায়ী মূল্যবোধকে বিভিন্নভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা যায় যেমন- ব্যক্তিগত, সামাজিক, মানবিক, ধর্মীয় ইত্যাদি।

শিক্ষায় মূল্যবোধের চর্চা, অনুসরণ ও উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। যেহেতু মূল্যবোধ সকল ধরনের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপকেই প্রভাবিত করতে পারে সেহেতু শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে নিজ দেশ ও সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত ইতিবাচক মূল্যবোধ তৈরি, চর্চা, অনুসরণকে উৎসাহিত করা হবে – যা শিক্ষাক্রমের রূপকল্প অর্জনে ভূমিকা রাখবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতে হলে সেগুলো অর্জন করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সম্পর্কিত মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে। এই মূল্যবোধের উৎস হলো বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় পরিচয় ও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট এবং বৈশ্বিক মূল্যবোধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেসব মূল্যবোধ চর্চার বিষয় এই শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিবেচিত হয়েছে, সেগুলো হলো:

- **সংহতি :** এক হয়ে থাকার মানসিকতা। ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অগ্রাধিকারকে পেছনে রেখে কতগুলো সামষ্টিক ইচ্ছা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিপ্রক্ষিতে সকলে মিলে বড় কোনো লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা।
- **দেশপ্রেম :** ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজ দেশের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখাই হচ্ছে দেশপ্রেম।
- **সম্প্রীতি:** ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদের মধ্যেও বিদ্যমান দৃঢ়তাসমূহের সম্মিলনে সর্বোচ্চ ঐক্য প্রদর্শন এবং বজায় রাখাই হচ্ছে সম্প্রীতি।
- **পরমতসহিষ্ণুতা :** ভিন্নমত বা ভিন্ন চিন্তাধারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা এবং এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহনশীলতা প্রর্দশন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের অনুসারীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা।
- **শ্রদ্ধা :** স্থায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষসহ সকল মানুষের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও গুণাবলির আলোকে পারস্পরিক ইতিবাচক অনুভূতির প্রকাশই শ্রদ্ধা বা সম্মান।
- **সহমর্মিতা:** অন্যের মনের অবস্থা ও অনুভূতি আন্তরিকভাবে অনুধাবন করে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া
- **শুদ্ধাচার :** শুদ্ধাচার মানে নিজের কাছে দায়বদ্ধ থেকে যেকোনো পরিস্থিতিতে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পরীবিক্ষণ ছাড়াই নিজ দায়বদ্ধতা থেকে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়াই শুদ্ধাচার।

চেতনা ও মূল্যবোধ বিমূর্ত অনুভূতি, বোধ বা ধারণা। এগুলোর অনুসরণ ও চর্চা হলো কিনা তা বোধগম্যতার সূচক হল মানুষের মাঝে কী কী গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হল তা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলি প্রত্যাশা করা হয়েছে যা অর্জন করলে চেতনা ও মূল্যবোধের চর্চার প্রতিফলন অনুভব করা যাবে।

গুণাবলি	বর্ণনা
সততা	একটি নৈতিক গুণ যা সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করে
উদ্যম	দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা
গণতান্ত্রিকতা	পরমতসহিষ্ণু এবং সকলের মত প্রকাশের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল

অসাম্প্রদায়িকতা	নিজ সম্প্রদায়সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল
উদ্যোগ	কোনো কাজ বা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হওয়া ও শেষ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত থাকা
ইতিবাচকতা	কোনো কাজ, কথা, ঘটনা বা বিষয়ের ভাল দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়া
নান্দনিকতা	সৃজনশীল কাজের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার চর্চা করার মননশীল মনোভাব পোষণ করা
মানবিকতা	মানুষ ও সৃষ্টি জগতকে ভালবাসা, পরিচর্যা করা, সংরক্ষণ করা ও নিরাপত্তা প্রদানে সচেষ্ট হওয়া
দায়িত্বশীলতা	সকল দায়িত্ব ও কাজ সময়মত, গুরুত্ব সহকারে ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা

২.৪.২.২ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় দৃষ্টিভঙ্গি বলতে শিখনের মাধ্যমে অর্জিত প্রবণতা বা সক্ষমতা, যা সচেতন বা অসচেতনভাবে কোনো বিষয়কে মূল্যায়ন করা অথবা কোনো ধারণা, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রতি নির্দিষ্ট উপায়ে সক্রিয় হওয়া বা সাড়া দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ওপর যা তার আচরণকে প্রভাবিত করে।[৩]

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি উপাদানকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে –

- ব্যক্তিগত বিশ্বাস
- ইতিবাচক সামাজিক রীতি সম্পর্কিত বিশ্বাস
- আত্মবিশ্বাস

২.৪.২.৩ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা

দক্ষতা হচ্ছে এক ধরনের সক্ষমতা (Ability or Capability) যা সুচিন্তিত, পদ্ধতিগত এবং স্থায়ী প্রচেষ্টার (Efforts) মাধ্যমে সাবলীল বা অভিযোজনক্ষম কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অর্জন করা যায়। কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপের ধরন, লক্ষ্য বা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে দক্ষতাও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। যেমন কোনো ধারণা নিয়ে কার্যক্রম হলে তা যেমন জ্ঞানগত দক্ষতা, আবার বস্তু নিয়ে হলে তা ব্যাবহারিক বা কারিগরি দক্ষতা এবং মানুষ বা সমাজ নিয়ে হলে তা সামাজিক, মনোসামাজিক বা আবেগীয় দক্ষতা।

দক্ষতাকে কোন প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্নভাবে ধারণায়ন (Conceptualization) করা হয়। যেমন : শিক্ষাক্রমে দক্ষতা হচ্ছে যোগ্যতার (Competencies) সামগ্রিক ধারণার একটি অংশ। আবার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যেমন, জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানগত দক্ষতার প্রয়োজন আবার মূল্যবোধ চর্চার জন্য মনোসামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার প্রয়োজন। একইভাবে ব্যাবহারিক দক্ষতা বা আবেগীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন এবং মূল্যবোধ চর্চা জরুরি।

বৃহত্তর পরিসরে সকল ধরনের দক্ষতাকে মূলত তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা যায় :

[3] http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/a/attitude

১. **মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills) :** যে দক্ষতাসমূহ অন্যান্য দক্ষতা, যোগ্যতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য, যেমন : সাক্ষরতা (Literacy, Numeracy), ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital literacy) ইত্যাদি।
২. **রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা (Transferable skills) :** যে দক্ষতাসমূহ প্রেক্ষাপট ও সময় অনুযায়ী রূপান্তর করে প্রয়োগ করা যায় এবং যা সময়ের সঙ্গে টিকে থাকতে সহায়তা করে, যেমন : সূক্ষ্ম চিন্তন, সৃজনশীল চিন্তন, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি।
৩. **জীবিকা-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা (Livelihood related skills) :** যে দক্ষতাসমূহ মানুষকে কোনো কাজ করতে পারদর্শী করে গড়ে তোলে। যেমন : বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) বা ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা।

এখানে উল্লেখ্য যে, গুচ্ছসমূহের দক্ষতাকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করা যায় না। এদের মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যেমন নিবিড়ভাবে থাকে তেমনি এক গুচ্ছের দক্ষতা অন্য গুচ্ছেও প্রবেশ করতে পারে।

শিক্ষায় দক্ষতার ধারণা অনেক পুরোনো হলেও সময় পরিবর্তনের সাথে যুগের চাহিদা অনুযায়ী তার নতুন ধারণা ও সংজ্ঞায়ন করা হয়। বিশেষ করে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে দক্ষতার সংজ্ঞা ও অর্জনের উপায় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত ডেলর কমিশনের (১৯৯৬) সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার চারটি স্তম্ভ বিভিন্ন দক্ষতাকে সংজ্ঞায়িত ও গুচ্ছবদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। ডেলর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দক্ষতাসমূহ নিম্নলিখিতভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা হয়েছে।

ডেলর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার স্তম্ভ	**দক্ষতার গুচ্ছ**
জানার জন্য শিখন (Learning to know)	শেখার দক্ষতা (Skills for learning)
পারদর্শিতার জন্য শিখন (Learning to do)	জীবিকার দক্ষতা (Skills for livelihood)
ক্ষমতায়নের জন্য শিখন (Learning to be)	নিজের ক্ষমতায়নের দক্ষতা (Skills for self-empowerment)
সকলের সঙ্গে বসবাসের জন্য শিখন (Learning to live together)	সক্রিয় নাগরিকের দক্ষতা (Skills for citizenship)

তাছাড়া, OECD ২০৩০ সালের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা রূপরেখায় দক্ষতাসমূহকে মূলত তিনটি গুচ্ছে সংজ্ঞায়িত করেছে।

১. জ্ঞানগত এবং চিন্তা নিয়ে চিন্তা করার দক্ষতা (Cognitive and meta cognitive skills)
২. সামাজিক ও আবেগীয় দক্ষতা (Social and emotional skills)
৩. বাস্তব বা ব্যবহারিক দক্ষতা (Physical and practical skills)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) পরিবর্তিত জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও অঙ্গীকার এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে ধারাবাহিক কারিগরি অনুশীলনের মাধ্যমে একটি সমন্বিত দক্ষতা রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। এই দক্ষতা রূপরেখার বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি একেবারেই বাংলাদেশের নিজস্ব প্রেক্ষাপটভিত্তিক, এবং এই দেশের তরুণ প্রজন্ম বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যেসকল চ্যালেঞ্জ ও বাধা মোকাবেলা করছে বা করবে তা বিবেচনায় নিয়ে একে ভবিষ্যৎমুখী করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আন্তর্জাতিক ধারণায়নসমূহের প্রতিফলনে এবং এনসিটিবি প্রণীত দক্ষতা রূপরেখা অনুসরণে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় নিম্নবর্ণিতভাবে দক্ষতাসমূহকে গুচ্ছবদ্ধ করা হয়েছে।

শিখতে শেখার দক্ষতা **(Skills for learning to learn)**	সূক্ষ্মচিন্তন (Critical thinking) সৃজনশীল চিন্তন (Creative Thinking) সমস্যা সমাধান (Problem solving)
ব্যক্তিগত ক্ষমতায়নের জন্য দক্ষতা **(Skills for personal empowerment)**	স্ব-ব্যবস্থাপনা (Self-management) (আত্ম সচেতনতা ও বিশ্লেষণ, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, স্ব-কার্যকারিতা), সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making) যোগাযোগ (Communication)
প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক ও সামাজিক দক্ষতা (Practical and social skills)	জীবন ও জীবিকার জন্য প্রস্তুতি (Life & Livelihood) সহযোগিতা (Cooperation) বিশ্ব নাগরিকত্ব (Global citizenship)
মৌলিক দক্ষতা **(Foundational skills)**	মৌলিক সাক্ষরতা, (Literacy & Numeracy) ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital Literacy) (তথ্য, প্রযুক্তি, মিডিয়া)

বর্ণিত দক্ষতাসমূহ যেন শিখনক্রম, যোগ্যতা, শিখন-শেখানো কৌশল এবং মূল্যায়ন কৌশলে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় সেজন্য গুচ্ছভিত্তিক দক্ষতাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

- **সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking skills)**

  কোনো বিষয় অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বা সমস্যা সমাধান করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করার বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking) নামে অভিহিত করা হয়। সূক্ষ্ম চিন্তন করার সময় মানুষ চিন্তনের কতগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ধাপ অনুসরণ করে কোনো একটি সমাধান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা যেকোনো জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক চিন্তন দক্ষতাকে সমন্বয় করে কাজ করে; যেমন: বিষয়টির ধরন অনুযায়ী চিন্তার কৌশল নিয়ে চিন্তা করা, অনুসন্ধানী প্রশ্ন করার কৌশল অনুসরণ, বিশ্লেষণ-সংযোজন ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ ইত্যাদি। এর ফলে জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

- **সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative thinking skills)**

  গতানুগতিক চিন্তাভাবনার বাইরে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে নতুন ধারণা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের দক্ষতাই সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় গতানুগতিক চিন্তা ধারার পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে; এর মাধ্যমে যেমন নতুন কৌশল ও উপায় বেরিয়ে আসে অন্য দিকে তেমনি নতুন পথের এবং সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন দক্ষতাই ব্যক্তি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

- **সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem solving skills)**

সমস্যা চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে সে সমস্যার কার্যকরী সমাধানে উপনীত হওয়ার দক্ষতাই সমস্যা সমাধান দক্ষতা। সমস্যা সমাধানের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চর্চা করার মধ্য দিয়ে এই দক্ষতা শাণিত হয়। এক্ষেত্রে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করা, সে অনুযায়ী সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাই করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision making skills)**

পরিস্থিতি অনুধাবন করে কোনো সমস্যার তথ্যভিত্তিক একাধিক সমাধানে উপনীত হওয়া এবং যৌক্তিকভাবে একটি সমাধান বাছাই করাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা। অনেকেই যৌক্তিক চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে যারা পারদর্শী তারা সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়টিকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন, এরপর সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিবেচনা করে সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন।

যোগাযোগ দক্ষতা (Communication skills)

কার্যকরভাবে ভাবের আদান-প্রদান, তথ্য বা মতামত গ্রহণ ও প্রকাশ করার দক্ষতাই যোগাযোগ দক্ষতা। আমরা বিভিন্ন ভাষিক ও অভাষিক (মৌখিক ও লিখিত বার্তা, অভিব্যক্তি, সংকেত ইত্যাদি) উপায় ব্যবহার করে তথ্য, মতামত, অনুভূতি ইত্যাদি গ্রহণ ও প্রকাশ করি। এক্ষেত্রে সক্রিয় শ্রবণ, উপস্থাপন শৈলি, আগ্রহের সঙ্গে বার্তা দেয়া-নেয়ার দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগ যোগাযোগ দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে।

- **স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management skills)**

সমৃদ্ধ জীবন ও উন্নত সমাজ গঠনে ব্যক্তির বিভিন্ন দক্ষতার পাশাপাশি প্রয়োজন স্ব-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকরভাবে আত্ম-পরিচর্যা বা নিজেকে ইতিবাচকভাবে পরিচালিত করার সক্ষমতা অর্জন করে ভালো থাকা। এজন্যে বিশেষ কিছু দক্ষতার সমন্বয় প্রয়োজন, যেমন : আত্মসচেতনতা ও আত্ম-বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, আবেগিক বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক সম্পর্কের ফলপ্রসূ ব্যবহার, প্রাত্যহিক জীবনযাপন দক্ষতা এবং সর্বোপরি সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা।

- **সহযোগিতামূলক দক্ষতা (Collaboration skills)**

কোনো কাজ সম্পাদনে ও উৎকর্ষ অর্জনে পারস্পরিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে প্রয়োজন সম-মনোভাব ও দলগত চেতনা সৃষ্টি করা। বৈচিত্র্যকে মূল্য দিয়ে বিভেদ কমিয়ে আনা, সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতার পরিধি প্রসারিত করা মূলত এই দক্ষতার অন্তর্গত।

- **বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global citizenship skills)**

বিশ্ব নাগরিকত্ব হলো এমন একটি ধারণা, যা মানুষকে জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করে সেখানে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার নিজ পরিসর, সমাজ, সংস্কৃতি তথা দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন যা বৈষম্যহীন বিশ্ব তৈরিতে এবং মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন প্রজন্ম, দেশ তথা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির

পরিবর্তন ঘটিয়ে সকলের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল, একীভূত, সুরক্ষিত এবং টেকসই বিশ্ব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। টেকসই উন্নয়নমুলক শিক্ষা (Education for Sustainable Development-ESD) কৌশল অনুসরণ করে বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন প্রজন্ম তৈরি করতে হবে।

- **জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability skills)**

  কর্মজগতের জন্য প্রস্তুত হতে এবং নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে যে দক্ষতাসমূহ প্রয়োজন তাই হচ্ছে জীবিকায়ন দক্ষতা। কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি নিজের কাজ নিজে করতে পারার দক্ষতা, আর্থিক সাক্ষরতা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা, ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও উদ্যোক্তা হওয়ার দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তা ও চাকুরি অনুসন্ধানের দক্ষতা, ভবিষ্যত কর্মদক্ষতা সুনির্দিষ্ট পেশায় নিয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এসকল দক্ষতাসমূহের উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

- **মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills – Literacy, Numeracy)**

  মৌলিক দক্ষতা বলতে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উপলব্ধি করে পড়তে, বলতে ও লিখতে বা প্রকাশ করতে, পরিমাপ ও হিসাব কষতে এবং বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে অনুসন্ধান করতে যেসব দক্ষতার প্রয়োজন হয় এক কথায় সেগুলোকেই বোঝায়। এছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে যেসকল মৌলিক দক্ষতার প্রয়োজন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাক্ষরতা।

- **ডিজিটাল দক্ষতা (Digital skills)**

  বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি নির্ভর সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে জীবনধারণ করতে ডিজিটাল দক্ষতা অত্যাবশ্যক। ডিজিটাল দক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ তথ্য ও মিডিয়া সাক্ষরতা, তবে এর পরিধি আরো ব্যাপক। একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র প্রযুক্তির ভোক্তা না হয়ে উদ্ভাবক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই দক্ষতাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করে সেই প্রক্রিয়া অনুধাবন করে বাস্তব সমস্যা সমাধানে ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, এবং প্রয়োজনে নতুন ডিজিটাল সলিউশন পরিকল্পনা, ডিজাইন ও বাস্তবায়নে যেসকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো ডিজিটাল দক্ষতার মধ্যে পড়ে। একইসাথে, বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা, বিভিন্ন প্রয়োজনে দক্ষতার সঙ্গে উপযুক্ত প্রযুক্তির যথাযথ, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করতেও ডিজিটাল দক্ষতা প্রয়োজন।

২.৪.২.৪ শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান

জ্ঞান হচ্ছে কোনো বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত তথ্য, ধারণা বা তত্ত্ব। জ্ঞান যেমন তত্ত্বীয় ধারণা নির্ভর, তেমনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো কার্যক্রম পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারার বাস্তব অনুধাবননির্ভরও। জ্ঞানকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। OECD দেশসমূহে ব্যবহৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা ও ধরন অনুসরণে এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় জ্ঞানকে চারটি ধরণে বিভাজিত করা হয়েছে।

১. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান (Disciplinary knowledge) : বিষয়ভিত্তিক ধারণা ও বিষয়বস্তু
২. আন্তঃবিষয়ক জ্ঞান (Inter-disciplinary knowledge) : একটি বিষয়ের ধারণা ও বিষয়বস্তুর সংগে অন্য বিষয়ের ধারণা ও বিষয়বস্তুর সংযোগ করতে পারা

৩. বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান (Epistemic knowledge) : বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের কাজ ও চিন্তা বুঝতে পারা
৪. পদ্ধতিগত জ্ঞান (Procedural knowledge) : কোন কাজ ধাপে ধাপে কীভাবে করতে হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান

২.৫ মূলনীতি

অভিলক্ষ্যসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম রূপরেখার রূপকল্পকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যে দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কিছু মূলনীতি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই মূলনীতিসমূহ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে, সেগুলো হলো:

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ
- একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক
- বৈষম্যহীন
- বহুমাত্রিক
- যোগ্যতাভিত্তিক
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক
- প্রাসঙ্গিক ও নমনীয়
- জীবন ও জীবিকা-সংশ্লিষ্ট
- অংশগ্রহণমূলক
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আনন্দময়

২.৬ মূল যোগ্যতা

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যে দশটি মূল যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে সেগুলো হলো :

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করতে পারা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন, নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে দূর্যোগ মোকাবিলা করতে পারা এবং নিরাপদ, সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যোগ্যতাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেই অনুযায়ী যোগ্যতার মূল চারটি উপাদান আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো : জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। উপর্যুক্ত দশটি মূল যোগ্যতায় ইতোমধ্যে নির্ধারিত মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। যোগ্যতার সকল উপাদান অর্জন নিশ্চিত করতে শুধু শিখন-ক্ষেত্র এবং নির্দিষ্ট বিষয়গুচ্ছ নয়, বরং শিখন-প্রক্রিয়া কেমন হবে তারও দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জগতে কোনো বিষয়ই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে না, বরং একে অপরের সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকে। তাই কোনো বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে শিখন পরিপূর্ণ হয় না। এই উপলব্ধি থেকে এই রূপরেখায় শিখনের ক্ষেত্রে ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

২.৭ শিখন-ক্ষেত্র

শিক্ষাক্রমের দশটি মূল যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের দশটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্র, পূর্বে নির্ধারিত নীতি, মূল্যবোধ, মূল যোগ্যতা ও দক্ষতা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় পর্যালোচনাসমূহের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ শিখন-বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে শিখন-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে। এই নির্বাচনের সময় স্থানীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন চাহিদা ও প্রেক্ষাপট যেমন বিবেচনা করা হয়েছে, একই সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে একাডেমিক অগ্রাধিকার এবং উচ্চশিক্ষা ও কর্মজগতের বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিপ্রেক্ষিত।

যোগ্যতাগুলো অর্জনকল্পে শিক্ষাক্রমে যেসকল শিখন-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো :

১. ভাষা ও যোগাযোগ (Language & Communication),
২. গণিত ও যুক্তি (Mathematics & Reasoning),
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science & Technology),
৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি (Digital Technology)
৫. পরিবেশ ও জলবায়ু (Environment & Climate),
৬. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব (Society & Global Citizenship),
৭. জীবন ও জীবিকা (Life & Livelihood),
৮. ধর্ম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা (Religion, Values & Morality),

৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা (Physical & Mental Health and Protection),

১০. শিল্প ও সংস্কৃতি (Arts & Culture)

২.৮ শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা

শিক্ষাক্রমে যে দশটি শিখন-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিখন-ক্ষেত্র এবং তার চাহিদা ও ব্যাপ্তি বিবেচনা করে শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে। সেগুলো হলো -

শিখন-ক্ষেত্র	শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
১. ভাষা ও যোগাযোগ	একাধিক ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা, সাহিত্যের রস আস্বাদনে সমর্থ হওয়া; বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।
২. গণিত ও যুক্তি	সংখ্যা ও প্রক্রিয়া (Operation), গণনা, জ্যামিতিক পরিমাপ এবং তথ্য বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমপরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক সমস্যা দ্রুত মূল্যায়ন করে এর তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ ফলাফল ও করণীয় জেনে যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকর যোগাযোগ করতে পারা। এছাড়াও সৃজনশীলতার সঙ্গে গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করে যৌক্তিক, কল্যাণকর সমাধান ও সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারা।
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট প্রপঞ্চ, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি ব্যাখ্যার আলোকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ দ্রুত মূল্যায়ন ও সমাধান করতে পারা। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ফলাফল, তাৎপর্য ও করণীয় নির্ধারণ এবং যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল, যৌক্তিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করতে পারা।
৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি	তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, যাচাই ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, পরিমিত, দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান এবং নতুন উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখতে পারা; ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যার অভিনব ডিজিটাল সমাধান উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিস্তরণ; এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে পারা।
৫. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব	নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারা। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ও অন্যের মতামত বিবেচনা করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখা।

শিখন-ক্ষেত্র	শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী
৬. জীবন ও জীবিকা	ক্রমপরিবর্তনশীল স্থানীয় ও বৈশ্বিক কর্মবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও টেকসই প্রাক-কর্ম যোগ্যতা অর্জন করা এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা। কর্মের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্ম-দক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনমুখীতা প্রদর্শন করে নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা। পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৃজনশীল কর্মজগতের উপযোগী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তুলতে পারা এবং কর্মজগতের ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা অর্জন করে নিজ ও সকলের জন্য সুরক্ষিত, নিরাপদ কর্মজীবন তৈরিতে অবদান রাখতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু	পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারা।
৮. ধর্ম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমমর্মিতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চর্চার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা ।
৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন ও এর প্রভাব এবং ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে যথাযথ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন করা। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে অবদান রাখা।
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি	শিল্পকলার বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য ইত্যাদি) ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ, শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার রস আস্বাদন করতে পারা, চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো; সংবেদনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ এবং নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করে অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং শিল্পকলাকে উপজীব্য করে কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

২.৯ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের উদ্দেশ্য

শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার প্রতিটি স্তরের কিছু সার্বজনীন এবং কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। সার্বজনীন উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষিক, নান্দনিক তথা সার্বিক বিকাশ– যা শিক্ষার সব স্তরেই গুরুত্ব পায়। তবে প্রাক-শৈশব, শৈশব, কৈশোর এবং কৈশোর-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, পরিপক্বতা ও মিথস্ক্রিয়ার ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের বিকাশ ও শিখনের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই শিক্ষার নির্দিষ্ট পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিকাশের পর্যায়

অনুযায়ী একেকটি নির্দিষ্ট চাহিদাকে কেন্দ্র করে বিবেচনা করা হয়। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্তরের উদ্দেশ্য নির্ধারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় নেয়া হয়, যা ধাপে ধাপে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমন : প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য থাকে বাড়ির চেনা পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম যা শিশুর সার্বিক বিকাশের ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আবার প্রাথমিক স্তরে মূলত গুরুত্ব আরোপ করা হয় পড়তে, লিখতে ও গুণতে শেখার মতো মৌলিক বা ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনের উপর যা ব্যবহার করে শিশু পরবর্তী স্তরে নানাবিধ যোগ্যতা অর্জন ও স্বশিখন অব্যাহত রাখতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে এসে শিক্ষার্থী একদিকে যেমন ভিত্তিমূলক দক্ষতা দৃঢ় করার মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন অব্যাহত রাখবে, তেমনি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে যা তাকে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে ক্রমশ ক্রিয়াশীল হতে সহায়তা করবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও তৎপরবর্তী সময়ে সে বিশেষায়িত ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে পেশাগত প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

উক্ত শিক্ষাক্রমে ব্যক্তিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বিকাশের ধরন ও চাহিদার পাশাপাশি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে স্তরভিত্তিক যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিচের চিত্রে উপস্থাপিত হলো।

এখানে আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি স্তরে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দেয়া হলেও, এই স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহ শুধু সংশ্লিষ্ট স্তরেই অর্জিত হবে এমন নয়, বরং প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরেই তা নিহিত থাকবে।

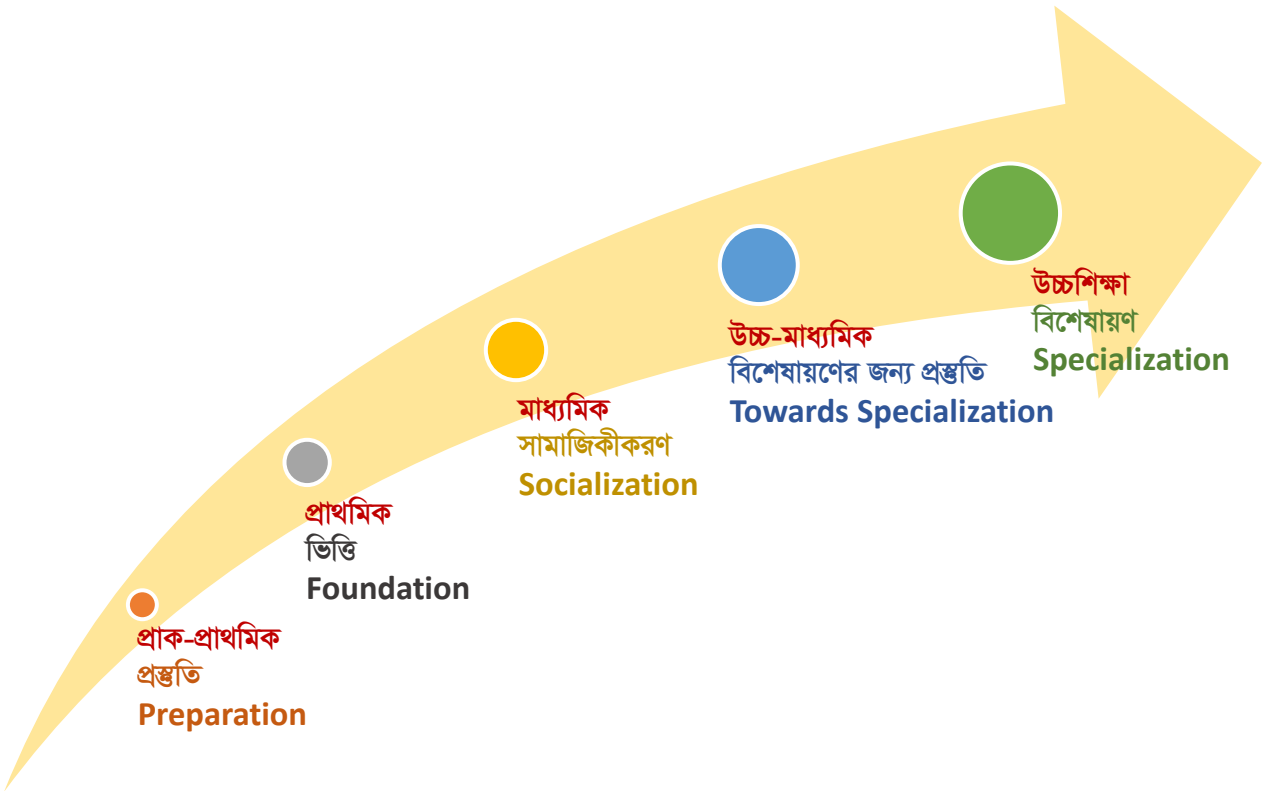

২.১০ স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়

নির্ধারিত দশটি শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় হলো শিশুদের পরবর্তী শিখনের জন্য প্রস্তুতিমূলক একটি পর্যায়, এই পর্যায়ে শিশুরা কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে আলাদাভাবে শিখনের পরিবর্তে সমন্বিতভাবে একাধিক বিষয় একসঙ্গে শিখনের জন্য অনুশীলন করবে। তবে প্রাথমিক (প্রথম থেকে পঞ্চম) এবং মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) স্তরে সুনির্দিষ্টভাবে যথাক্রমে আটটি ও দশটি বিষয় পাঠ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার ফলে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়ের বিন্যাসে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়েছে, এবং শিক্ষার্থীর ধাপে ধাপে উত্তরণ যাতে স্বচ্ছন্দ এবং চাপমুক্ত হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের এই বিষয়সমূহ নির্বাচনের সময় অনেকগুলো দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ এবং বিকাশের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়ের সংখ্যা ও ধরন ঠিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত মূল যোগ্যতাসমূহ এবং তার ধারাবাহিকতায় শিখন-ক্ষেত্রসমূহের যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সমর্থ হয়, কিন্তু একই সঙ্গে বিষয়বস্তুর চাপ যাতে বেড়ে না যায় সেজন্য থিমভিত্তিক ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে। শিখনকে কার্যকর ও আনন্দময় করতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর জোর দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে একই শিখন-কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে একাধিক বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব।

নিচে ছকের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিষয়সমূহের বিন্যাস দেখানো হয়েছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শিখনক্ষেত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্পর্ক স্পষ্টত লক্ষণীয়, বস্তুত সকল বিষয়ই সকল শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখবে। কেননা শিখন-ক্ষেত্র ও বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্কটি একমুখী নয়।

২.১০.১ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় ও প্রাথমিক স্তরের নির্বাচিত বিষয়সমূহ

শিখন-ক্ষেত্র	প্রাক-প্রাথমিক	প্রাথমিক
ভাষা ও যোগাযোগ	সমন্বিত বিষয়	• বাংলা • ইংরেজি • গণিত • বিজ্ঞান • ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান • স্বাস্থ্য সুরক্ষা • ধর্মশিক্ষা • শিল্প ও সংস্কৃতি
গণিত ও যুক্তি		
জীবন ও জীবিকা		
সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব		
পরিবেশ ও জলবায়ু		
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি		
ডিজিটাল প্রযুক্তি		
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা		
ধর্ম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা		
শিল্প ও সংস্কৃতি		

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মাধ্যমিক স্তরে *ডিজিটাল প্রযুক্তি* এবং *জীবন ও জীবিকা* আলাদা বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে এই দুইটি আলাদা বিষয় হিসেবে না থাকলেও এই বিষয়দ্বয়ের অন্তর্গত শিখনযোগ্যতা অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্য দিয়ে সমন্বিতভাবে অর্জিত হবে।

২.১০.২ মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ থেকে দশম) নির্বাচিত বিষয়সমূহ

শিখন-ক্ষেত্র	মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণি)
ভাষা ও যোগাযোগ	• বাংলা
গণিত ও যুক্তি	• ইংরেজি
জীবন ও জীবিকা	• গণিত
সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব	• বিজ্ঞান
পরিবেশ ও জলবায়ু	• ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	• ডিজিটাল প্রযুক্তি
ডিজিটাল প্রযুক্তি	• জীবন ও জীবিকা
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	• স্বাস্থ্য সুরক্ষা
ধর্ম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	• ধর্মশিক্ষা
শিল্প ও সংস্কৃতি	• শিল্প ও সংস্কৃতি

২.১০.৩ শিখন-ক্ষেত্র থেকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য দিক

সাম্প্রতিক সময়ে থিমভিত্তিক ও আন্তঃবিষয়ক কৌশলের (ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ) ইতিবাচক ফলাফলকে নজরে এনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রমে এই কৌশল বা অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে। এই বাস্তবতা সামনে রেখে, এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে এই রূপরেখায় মাধ্যমিক পর্যায়ে মূল বিষয়ের পাশাপাশি থিমভিত্তিক বিষয়ও রাখা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে নমনীয়তা নীতি গ্রহণ করার ফলে ভবিষ্যতেও এই বিষয় বিন্যাসকে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সাজানোর সুযোগ রয়েছে। থিমভিত্তিক বিষয়গুলো ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও একাধিক আলোচনার ক্ষেত্রের সমন্বয় ঘটেছে, যেমন ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানকে একটি বিষয় হিসেবে ধরা হলেও, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ভূগোল এসকল বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে এখানে। একইভাবে, বিজ্ঞান বিষয়ে ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান এসকল ক্ষেত্রের শিখনযোগ্যতার সমন্বয় থাকছে। ভাষা শিক্ষায় শোনা, বলা, পড়া, লেখার মত মৌলিক দক্ষতা শুধু নয়, বিকল্প যোগাযোগ দক্ষতাও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যেহেতু প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিখনক্ষেত্রসমূহ অভিন্ন থাকছে, কাজেই শিক্ষার্থীরা যাতে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেজন্য স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্তরভেদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি বা কম দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে যেহেতু ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কাজেই মাতৃভাষা, যোগাযোগ ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জনকে এই স্তরে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। একইভাবে, মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) স্তরের সকল শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারে এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের যোগ্যতাসমূহ অর্জন করে জাতীয়তাবোধসম্পন্ন বিশ্বনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য এই স্তরে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ও ইংরেজি বিষয় অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণিতে মোট ভরের (weightage) তিন চতুর্থাংশ বিশেষায়িত বিষয়সমূহের জন্য এবং এক চতুর্থাংশ ভর আবশ্যিক বিষয়সমূহের জন্য বরাদ্দ থাকবে এবং এই বিষয়গুলোতে বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের যোগ্যতাসমূহের সমন্বয় থাকবে। এই সমন্বিত বিষয়সমূহে প্রায় সকল শিখনক্ষেত্রের বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলন থাকতে পারে।

২.১১ বিষয় ও বিষয়ের ধারণায়ণ

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় উল্লিখিত দশটি মূল যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দশটি শিখন-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার এই দশটি শিখন-ক্ষেত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কী ধরনের যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে বোঝার জন্য শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে। শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক এই যোগ্যতাবিবরণীর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কী কী বিষয় থাকবে সেগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে।

দশটি মূল যোগ্যতা, সংশ্লিষ্ট শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতা এবং সর্বোপরি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃতি ও পরিসরসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনায় নিয়ে বিষয়সমূহের ধারণায়ন করা হয়েছে। শিখন-ক্ষেত্র থেকে বিষয় **ধারণায়ণ** করার সময় যে দিকগুলোতে লক্ষ্য রাখা হয়েছে :

- শিখনক্ষেত্রের ধরন, মূল যোগ্যতাসমূহ অর্জনে কী কী দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো গুরুত্ব পেয়েছে।
- বিষয়ভিত্তিক মাত্রা বা ডাইমেনশন অনুসারে বিষয়ের ক্রমবিকাশ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।
- বিষয়ের মৌলিক/ প্রয়োজনীয় শিখন তত্ত্ব ও তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূল বিষয়বস্তুসমূহের প্রতিফলন ঘটে।
- বিষয়ের প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে এর পরিসর নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিষয়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে।
- শিক্ষাক্রমের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পরিবর্তনশীল পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই রূপরেখায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণির বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করা হলেও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে দেয়া হয়নি। যেহেতু একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির মূল লক্ষ্য বিশেষায়ণের জন্য প্রস্তুতি, এই পর্যায়ে বিশেষায়িত বিষয়সমূহের উপর অধিক জোর দেওয়া হবে যা উচ্চ শিক্ষা ও কর্মজগতের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করবে। আবশ্যিক বিষয়সমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যেখানে একাধিক

শিখন-ক্ষেত্রের প্রতিফলন থাকবে। শিক্ষার্থীকে কর্মজগতের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য একটি প্রায়োগিক বা ঐচ্ছিক বিষয় পছন্দ করারও সুযোগ থাকবে।

বিষয় : বাংলা

পটভূমি

অন্যান্য বিষয় শেখার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে একই সঙ্গে অন্যান্য বিষয় শিখনের মাধ্যমেও বাংলা ভাষার ভিত্তি দৃঢ় হবে।

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রমিত বাংলা ভাষায় ভাব আদান-প্রদানের (শোনা, বলা, পড়া, লেখা, দেখা ও অনুভব করার) মৌলিক দক্ষতা অর্জন করতে পারা; বাংলা ভাষার মৌলিক দক্ষতা ব্যবহার করে শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান অন্বেষণে সমর্থ হওয়া। সাহিত্যপাঠে আনন্দ লাভ করতে পারা; বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে বিভিন্ন মাধ্যমে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।

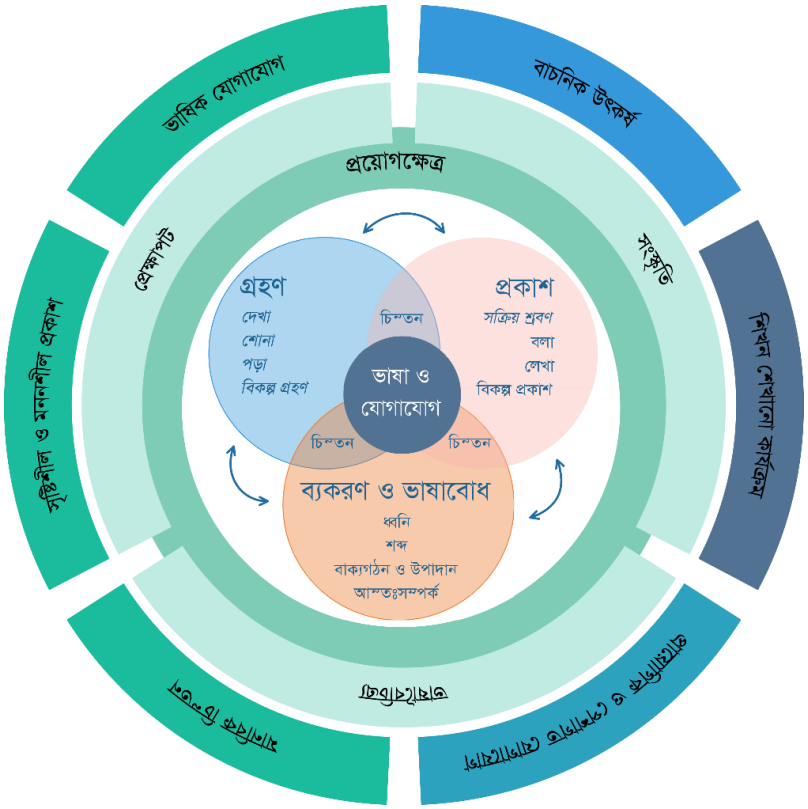

বিষয়ের ধারণায়ন

ভাষা সকল ধরনের যোগাযোগের মাধ্যম, একই সঙ্গে জ্ঞান ও চিন্তার বাহন। শিক্ষাতাত্ত্বিক দিক থেকে ভাষা শিখন-প্রক্রিয়া ও শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রধান ভিত্তি। শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১-এ বাংলা বিষয়কে প্রধানত ভাষা ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয় শিখনের মাধ্যম হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী যোগাযোগে পারদর্শী হয়ে উঠবে। রূপরেখায় ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার পাশাপাশি দেখা ও অনুভবকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে ।

রূপরেখায় শিক্ষার্থীর ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভাষাবোধ গড়ে ওঠে প্রধানত ইন্দ্রিয় সংবেদনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং ভাষা-সংগঠন বা ব্যাকরণ প্রভৃতির আন্তঃসম্পর্কসূত্রে। ভাষাবোধের দৃঢ় ভিত্তির ওপর নির্ভর করে ভাষার যথাযথ, শুদ্ধ ও পরিশীলিত প্রয়োগ অর্থাৎ ভাষা এক দিকে গ্রহণমূলক, অন্য দিকে প্রকাশমূলক। দেখা, শোনা, অনুভব, পড়া প্রভৃতির মাধ্যমে ভাষাভাষীর মধ্যে গড়ে ওঠে গ্রহণমূলক পারদর্শিতা। সেই সঙ্গে বলা, লেখা, ইশারা, স্পর্শ, সক্রিয় শ্রবণ প্রভৃতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে ভাষার প্রকাশমূলক পারদর্শিতা। শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বিকল্প গ্রহণ ও বিকল্প প্রকাশকেও বিশেষ

গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা সকল শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা ও আবেগিক বুদ্ধিবৃত্তিতে (emotional intelligence) বৈচিত্র্য রয়েছে। শিক্ষার্থীরা অনুভব, স্পর্শ, ঘ্রাণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিচিত্রভাবে বাস্তব বিশ্বকে অনুভব ও অনুধাবন করে থাকে; এ-কারণে তাদের প্রকাশও হয়ে থাকে ভিন্ন মাধ্যম ও প্রক্রিয়ায়।

ভাষা ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার ৬টি প্রধান প্রয়োগ-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে :

১. ভাষিক যোগাযোগ;
২. বাচনিক উৎকর্ষ;
৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রম;
৪. প্রায়োগিক ও পেশাগত যোগাযোগ;
৫. মানবিক চিন্তন;
৬. সৃষ্টিশীল ও মননশীল প্রকাশ।

ভাষিক যোগাযোগ বলতে বুঝানো হয়েছে বাচনিক ও অ-বাচনিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার যোগাযোগ ও সংজ্ঞাপনকে। শিক্ষার্থীর বলার ধারাক্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বাচনিক উৎকর্ষ হিসেবে। প্রায়োগিক ও পেশাগত যোগাযোগ বলতে বোঝানো হয়েছে ব্যবহারিক ও পেশাগত জীবনে বাংলা ভাষার যথাযথ প্রয়োগকে; মূলত বিভিন্ন পরিসর এবং পেশাগত জীবনে বাংলা ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরি করে দেবে বাংলা বিষয়। বাংলা ভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ-ক্ষেত্র হয়ে উঠবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম; সকল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জিত হবার প্রধান মাধ্যম বাংলা ভাষা। তাই বাংলা ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান-অর্জন দক্ষতাকে বৃদ্ধি করবে, শিখন-শেখানো কার্যক্রম হয়ে উঠবে সহজতর ও সহজবোধ্য। বর্তমান শিক্ষাক্রমে বাংলাকে বিবেচনা করা হয়েছে শিক্ষার্থীর মানবিক চিন্তন দক্ষতার প্রয়োগ ও বৃদ্ধির ভাষা হিসেবে। রূপরেখায় চিন্তাকে দেখা হয়েছে মানবিক, যৌক্তিক, সহনশীল ও ইতিবাচকভাবে। চিন্তন-দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাষাশৈলিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেমন : বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণাত্মক ইত্যাদি। সৃষ্টিশীল ও মননশীল প্রকাশ বলতে বোঝানো হয়েছে শিক্ষার্থীর সৃজন ও যুক্তিশীল কর্মকাণ্ডকে; এই প্রকাশ হতে পারে লিখন, বাচন, অংকন, সৃজন, সংজ্ঞাপননির্ভর। সামগ্রিকভাবে বাংলা বিষয় হয়ে উঠবে যোগাযোগ, সংজ্ঞাপন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম, চিন্তন ও প্রকাশের প্রধান ভাষা-মাধ্যম।

Subject: English

Subject wise competence statement

To be able to communicate effectively using basic skills of English language for day to day purposes, academic purpose and other specific purposes; to be able to exert creative as well as critical insights to express aesthetically, and to appreciate English literary text; to be able to uphold democratic practice in communication at the individual, social, national and global contexts.

Subject conceptualization

Since English is viewed as a foreign language in Bangladesh, the K-12 curriculum of English needs to maintain a balance of focus between real life application and a good understanding of the contexts in which the language learners are going to use English.

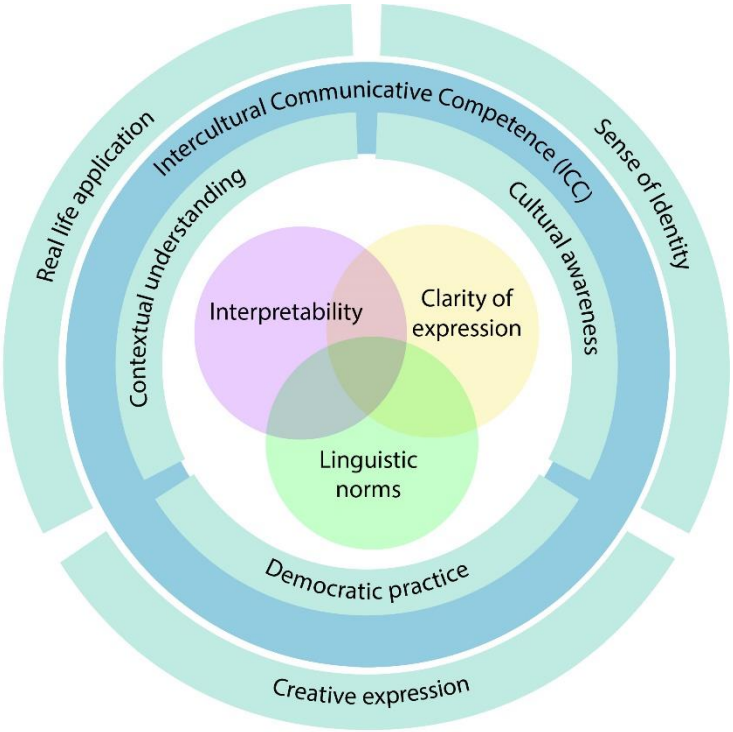

This diagram illustrates how English as a subject is conceptualized in this curriculum framework. The centre of the diagram contains the core knowledge and skills required for a learner. In terms of knowledge, it covers **linguistics rules** along with their **use** relevant for the local and global contexts. One key skill, **interpretability**, taps learners' ability to interpret and understand literal as well as intended meaning of a given verbal or non-verbal text. Another skill is **clarity of expression**, and it demands the learners' ability to express clearly, concisely, distinctively, and appropriately in effective communication. However, effective communication does not rely only on any particular knowledge and sets of skills, rather it requires **contextual understanding** and **cultural awareness** along with a **democratic attitude**. These three aforesaid components form a mediating lens which leads to the idea of **Intercultural Communicative Competence (ICC).**

A context sensitive cultural awareness in communication denotes an empathetic attitude, and ensures admiration and appreciation to diverse practice in communication. Consequently, a democratic attitude on part of the language users becomes mandatory as it facilitates a mindset to acknowledge different opinions in communication and the varied ways of expression, as well as the readiness to articulate personal viewpoints.

In terms of English teaching-learning, as a *second* or *foreign* language, the prevalent ideas of communicative competence has been questioned in relation to the notion of sociolinguistic competence. The idea of sociolinguistic competence to an extent celebrates the cultural norms

and practice embedded in English speaking society. As a matter of fact, language is not a value-free media, rather it carries a particular culture which can create a social hierarchy in relation to English and non-English speaking contexts. In accordance with the presentation of the language itself and the culture associated, it is essential for learners from a non-English speaking context to have a critical insight when learning to communicate in that particular language. That leads to the concept of ICC and it acts like a mediating lens to regulate learner's interpretation and expression following the linguistic norms, and equip them to practice English in preferred manner.

Through ICC, the core knowledge and skills are mediated for the applications in three major areas which are - **real life application, sense of identity,** and **creative expression**. **Real life application** covers the practice of English in everyday communication, for academic purpose, as well as for other specific purposes. As language is a media to exchange thoughts and emotion, learners need to internalize aesthetic value for **creative expression** as well as to appreciate the beauty of literature. Additionally, being recognized as an international language, English enables learners to access and appreciate arts and literature from different contexts and culture across the world. Apart from real life application and creative expression, another field of application is unveiled with the language users' capability to demonstrate a **sense of identity** in their practice. Learners' sense of identity equips them with the ability to recognize and evaluate the linguistic norms with regard to the power relation in a particular cultural context; and therefore, empowers them with the ability to prefer appropriate norms over others in accordance with the context. Consequently, it enables the learners to minimize the discriminatory aspects of linguistic practice and promote democratic practice in communication.

It is worthwhile to mention that, existing English curriculum in primary and secondary level promotes some of the aspects mentioned above. However, since that curriculum was not competency based, rather mostly focused on contents, this is presumably difficult for both the teachers and learners to relate the activities with the notion those were meant for. On that account, this framework attempts to connect the dots and incorporate an integrated approach in order to decipher the curricular competencies into meaningful classroom activities. This approach aligns it with the recent global trends in ELT with reference to EFL pedagogical context; and thereby, the tenets of critical and post-method pedagogy are contemplated and their implications are embedded in this curriculum framework.

বিষয়: গণিত

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

সংখ্যা, গণনা, জ্যামিতি, পরিমাপ ও তথ্য বিশ্লেষণের ধারণা আয়ত্তীকরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক সমস্যার দ্রুত মূল্যায়ন করে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে বর্তমান সমস্যার সমাধান ও ভবিষ্যত সমস্যা সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করতে পারা। এছাড়া গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করে যৌক্তিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শন ও প্রয়োগ করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

গণিত এমন একটি চিন্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিমূর্ত ধারণাকে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। তাই গণিতের মূল ভিত্তি যুক্তি ও সৃজনশীলতা। জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যা থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক হিসাব নিকাশ পর্যন্ত গণিতের বিস্তৃতি দৃশ্যমান।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়নের ক্ষেত্রে শুধু কিছু সূত্র মুখস্থ করে তার সাহায্যে পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক সমস্যা সমাধান নয় বরং গণিতের প্রকৃতি, যৌক্তিক চিন্তন, বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রয়োগ ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেজন্য এই বিষয়ের ধারণায়নের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে গাণিতিক অনুসন্ধান, যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা গাণিতিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করবে। গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য চারটি ডাইমেনশন নির্ধারণ করা হয়েছে, যেগুলো হল: সংখ্যা ও পরিমাণ, গাণিতিক সম্পর্ক, আকৃতি এবং সম্ভাব্যতা। এই চারটি ডাইমেনশনে গাণিতিক অনুসন্ধান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে তা সে তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবে। এসকল প্রয়োগক্ষেত্রকে চারটি মূল ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যেমন : দৈনন্দিন জীবনে, সমাজ জীবনে, কর্মজগতে এবং গণিতের উচ্চতর শিখন ও গবেষণাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে।

গণিত বিষয়ের ধারণায়নে উঠে আসা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল।

গাণিতিক অনুসন্ধান

গণিত বিষয়ের একটি মূল লক্ষ্য হলো গাণিতিক সাক্ষরতা– যা বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কীভাবে সমস্যাকে পরিকল্পনা করতে হয় এবং এর একটি গাণিতিক রূপ দিয়ে তা ব্যাখ্যা ও সমাধান করা যায় সে ধরনের সক্ষমতা প্রদান করে। আর সমস্যা সমাধানের এই সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়াকে বলা হয় গাণিতিক অনুসন্ধান। গণিত হচ্ছে যথার্থভাবে সংজ্ঞায়িত বস্তু এবং ধারণা সম্পর্কিত বিজ্ঞান, যেখানে গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে বস্তু বা ধারণার ব্যাখ্যা ও রূপান্তরের মাধ্যমে একটি নিশ্চিত উপসংহারে পৌঁছা সম্ভব হয়।

বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্যভাবে যুক্তি উপস্থাপন একটি দক্ষতা। প্রযুক্তিনির্ভর এ বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ এ দক্ষতাটির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীরা তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে এমন একটি ফলাফলে উপনীত হয় যেটিকে তারা পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে সঠিক বলে মনে করে। গাণিতিক

অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে উপসংহারে পৌঁছানো যায় তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ হয় এবং বাস্তব বা বিমূর্ত যেকোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধানে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এজন্য এই রূপরেখায় গাণিতিক অনুসন্ধানকে ধারণায়নের মডেলের কেন্দ্রে অবস্থান দেওয়া হয়েছে।

গাণিতিক অনুসন্ধানের আলোকে যে বিষয়গুলো উপলব্ধি করা যায় সেগুলো হলো :

- পরিমাণ, সংখ্যা-কাঠামো ও তাদের বীজগণিতীয় সম্পর্ক উপলব্ধি করা
- বিমূর্ত ধারণা ও তাদের প্রতীকীয় সৌন্দর্য উপভোগ ও কদর করা
- গাণিতিক গঠন এবং তাদের ধারাবাহিকতা দেখা
- রাশিসমূহের কার্যকর সম্পর্ক মেনে নেওয়া
- ভৌত, জীব, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আচরণিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গাণিতিক মডেলকে লেন্স হিসেবে ব্যবহার করা
- পরিসংখ্যানের প্রাণ হিসেবে চলকের ভূমিকা উপলব্ধি করা (পিসা ২০২১: গণিত ফ্রেমওয়ার্ক)

এবার আমরা গাণিতিক অনুসন্ধানের উপলব্ধিগুলোকে যদি বিশ্লেষণ করি তা হলে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে:

১. তাত্ত্বিক দিক : যার মধ্যে রয়েছে, সংখ্যা ও পরিমাণ, গাণিতিক সম্পর্ক, আকৃতি ও সম্ভাব্যতা।
২. ব্যবহারিক দিক : যার মধ্যে রয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, দৈনন্দিন জীবন, কর্মজগৎ ও সমাজ।

একজন শিক্ষার্থী গাণিতিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে চারটি ডাইমেনশন বা ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে বিকশিত হবে তার একটি বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো :

- **সংখ্যা ও পরিমাণ**

সংখ্যা একটি বিমূর্ত ধারণা। সংখ্যার সঙ্গে যখন পরিমাণ যুক্ত হয় তখন সংখ্যা বোধ তৈরি হয়। পরিমাণের ধারণা ছাড়া সংখ্যা ব্যাখ্যা সহজ নয়।

আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই তা হলে দেখতে পাই, মহাবিশ্ব হচ্ছে গ্যালাক্সি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য অণু পরমাণুর মহাসাগর যেখানে বস্তুসমূহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনা। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা এবং প্রতিটি সত্তার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং তার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সংখ্যা ও পরিমাণের ধারণা; অর্থাৎ সংখ্যা-বোধ হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গাণিতিক দিক, যা শিক্ষার্থীকে এই বিশাল জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে মহাবিশ্বের নানা বস্তুকণার বৈশিষ্ট্য, সম্পর্ক ও অবস্থানকে সংখ্যার আলোকে প্রকাশ করা এবং পরিমাণের আলোকেই এ প্রকাশকে দেখার চেষ্টা করা। পরিমাণের এ ধারণা থেকে আমরা পরিমাপ, গণনা, বিস্তার, একক, নির্দেশক, আকৃতি, ক্রমিক সংখ্যার প্রবণতা ও প্যাটার্ন উপলব্ধি করি। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ প্রকৃতির এই ঐক্য ও শৃঙ্খলাকে বুঝতে চেষ্টা করেছে, এবং বহু প্রজন্মের চিন্তন, চর্চা, ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতের নিয়ম কানুনকে ব্যাখ্যা করার পথে ধীরে ধীরে এগোনোর চেষ্টা করেছে।

পৃথিবীর বিশালত্ব পরিমাপ এবং বর্ণনা করার জন্য তাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা একটি প্রাথমিক প্রক্রিয়া। যা কোনো একটি অবস্থার মডেলিং, পরিবর্তন ও সম্পর্ক পরীক্ষণ, আকার আকৃতি এবং তথ্য সংগঠন ও অনিশ্চয়তা পরিমাপ করার অনুমতি প্রদান করে।

- **গাণিতিক সম্পর্ক**

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জগতের বস্তু এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বহু ধরনের স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পর্ক দেখা যায়। যেখানে একটি সিস্টেমের ভেতর ঘটে চলা বস্তুসমূহের পরিবর্তন অথবা পারিপার্শ্বিকতায় একটি উপাদান আর একটি উপাদানকে কীভাবে প্রভাবিত করছে তা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এ পরিবর্তন দীর্ঘ কিংবা অল্প সময়ব্যাপী সংঘটিত হয়। আবার অন্য ক্ষেত্রে একটি বস্তু বা পরিমাণ অন্যটির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় আলাদা আলাদা আবার কখনো কখনো তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে থাকে। এই সম্পর্কগুলো কখনো কখনো প্রকৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। গাণিতিক মডেলের আলোকে এ পরিবর্তন পূর্বানুমান ও ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ গাণিতিকভাবে পরিবর্তন এবং সম্পর্ককে যথাযথ ফাংশন এবং সমীকরণের সাহায্যে মডেলিং করা যায়। এই মডেলই বাস্তব জীবনের কোনো ঘটনাকে প্রতীক বা গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে।

- **আকৃতি**

আমরা আমাদের দৃশ্যমান জগতে প্রতিনিয়ত আকার আকৃতি সম্পর্কিত প্রপঞ্চের (phenomena) সম্মুখীন হই যেমন; জ্যামিতিক প্যাটার্ন, বস্তুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, অবস্থান এবং ওরিয়েন্টেশন, বস্তুর উপস্থাপন, দৃশ্যমান তথ্যের কোডিং এবং ডিকোডিং, বাস্তব আকৃতির সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া ইত্যাদি। জ্যামিতিক ধারণা আকার আকৃতির ব্যাখ্যায় ভিত তৈরি করলেও পরিমাপ এবং বীজগণিতের ধারণায়নেও জ্যামিতির ভূমিকা রয়েছে।

আমরা সচরাচর যে ধরনের আকৃতি দেখতে পাই তা প্রতিসম (symmetrical) নয়। তাই জ্যামিতির সহজ সূত্রের সাহায্যে এ ধরনের অনিয়মিত আকৃতি পরিমাপ করা জটিল। কাজেই আকৃতির পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি কাছাকাছি ফলাফলের উপরই নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে যতটা ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব তা করা হয়ে থাকে।

- **সম্ভাব্যতা**

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রাত্যহিক জীবন বা সমাজে সম্ভাব্যতা বা অনিশ্চয়তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই সম্ভাব্যতা বা অনিশ্চয়তা গাণিতিক ব্যাখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে, সম্ভাব্যতা যাচাই, তথ্য উপস্থাপন – এ সব ক্ষেত্রই অনিশ্চয়তার ঘটনা একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি নির্ধারণ, নির্বাচনী মতামত, জনসংখ্যার প্রবণতা ইত্যাদি উপস্থাপনে গ্রাফ ও পরিসংখ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রই একটি সম্ভাব্য ফলাফলের উপর আলোকপাত করে। ডাটা সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্যতা উপস্থাপন করাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখিত চারটি ডাইমেনশনের আলোকে অর্জিত গাণিতিক সাক্ষরতা একজন শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপটভেদে সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে পারছে কিনা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এই প্রয়োগের চারটি প্রধান ক্ষেত্র তুলে ধরা হলো:

- **গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি**

  গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর শিখন ও গবেষণাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্র; যেমন : আবহাওয়া ও জলবায়ু, বাস্তুসংস্থান, মহাকাশ বিজ্ঞান, ওষুধ প্রস্তুত, জেনেটিক্স ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে গাণিতিক সাক্ষরতার প্রয়োগ প্রয়োজন হয়।

- **দৈনন্দিন জীবন**

  দৈনন্দিন জীবনে নানা ক্ষেত্রে মানুষকে প্রতিনিয়ত গণিতের ব্যবহার করতে হয়। যেমন : খাবার প্রস্তুত, ক্রয় বিক্রয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, যাতায়াত, ভ্রমণ, প্রতিদিনের কাজের সূচি তৈরি ইত্যাদি।

- **কর্মজগত**

  কর্মজগতের অনেক সমস্যা সমাধানে গণিতের ধারণা ব্যবহার করতে হয়। যেমন : পরিমাপ, বাজেট প্রণয়ন, হিসাব নিকাশ, মান নিয়ন্ত্রণ, অফিস সময়সূচি, বর্ণনামূলক তালিকা, নকশা প্রণয়ন, চাকুরি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য।

- **সমাজ**

  সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত; যেমন : স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গণিতের জ্ঞান প্রয়োগ করতে হয়। যেমন : নির্বাচন-ব্যবস্থা, গণপরিবহণ, সরকার, জনমিতি, বিজ্ঞপ্তি প্রদান, জাতীয় পরিসংখ্যান, অর্থনীতি ইত্যাদি।

বিষয় : বিজ্ঞান

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর রহস্য উদ্ঘাটন করা ও এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন করা এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক কল্যাণে ইতিবাচক অবদান রাখা।

বিষয়ের ধারণায়ণ

বিজ্ঞান সমাজ বা প্রকৃতির বাইরে কোন পৃথক বিষয় নয়, বরং প্রকৃতির ঘটনাবলিকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করা বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজেই এই রূপরেখায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে শুধু তত্ত্ব ও তথ্য এবং পরীক্ষাগারে নির্ধারিত কিছু পরীক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা অর্জনের উপর জোর দেয়া হয়েছে – যা শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনাচরণের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

শিক্ষাক্রমের বিষয় হিসেবে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব এবং সংশ্লিষ্ট শিখন-ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় নিম্নলিখিতভাবে এর ধারণায়ন করা হয়েছে-

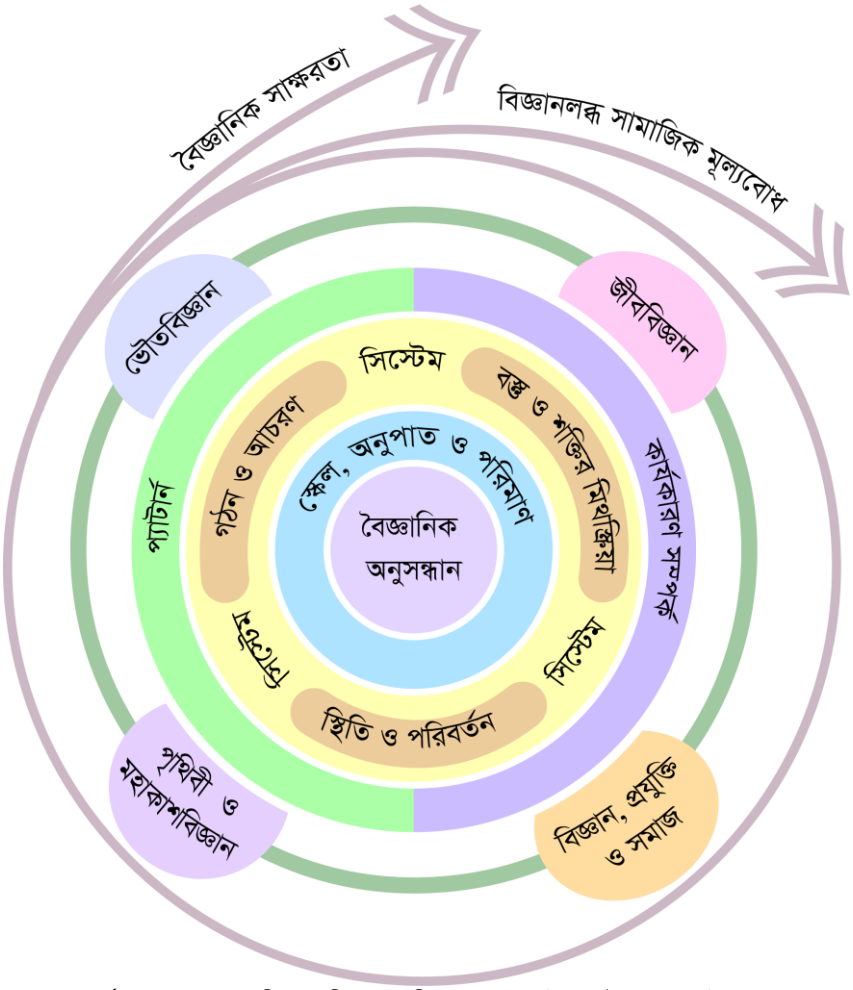

বিজ্ঞান অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চালায়। এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য স্কেল, অনুপাত ও পরিমাণের ধারণার প্রয়োজন পড়ে। কোন সিস্টেমে ঘটে চলা ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করার জন্য ওই সিস্টেমকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, বিবেচনায় নিতে হয়

সিস্টেম ও এর উপাদানসমূহের গঠন ও আচরণ, তাদের স্থিতি ও পরিবর্তন, এবং সিস্টেমের ভেতরে চলতে থাকা বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত প্রমাণনির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে এসব ঘটনার প্যাটার্ন ও কার্যকারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জ্ঞান বারবার পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর একটা সময় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। সময়ের সঙ্গে উদঘাটিত বৈজ্ঞানিক তথ্য, তত্ত্বের সমন্বয়ে বয়ে চলা বিজ্ঞানের মূল স্রোত থেকে ক্রমান্বয়ে তিনটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র উন্মোচিত হয় : *ভৌতবিজ্ঞান*, *জীববিজ্ঞান* এবং *পৃথিবী ও মহাকাশবিজ্ঞান*। এই তিনটি বিশেষায়িত ক্ষেত্রের বাইরেও আরেকটি আলোচনার ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা হল *বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ*।

বিজ্ঞানের তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করে নয়, বরং অনুসন্ধানমূলক শিখনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের দর্শন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইত্যাদির উপর সম্যক ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত করে তোলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এর ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা গড়ে উঠবে। একই সঙ্গে তারা দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে ও বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক (Socio-scientific) মূল্যবোধ ধারণ করে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল আচরণ করবে।

বিজ্ঞান বিষয়ের ধারণায়নে উঠে আসা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল।

- **বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান :** প্রতিটি ব্যক্তি জন্মগতভাবে অনসুন্ধানী মন নিয়ে জন্ম নেয়। সমাজ এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু এবং ঘটনা তাঁর কৌতূহলী মনকে আরো বেশি নাড়া দেয়। সে জানতে চায় এর কারণ কী? এর পেছনের ঘটনা কী? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যে পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় তা হল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হল কিছু কৌশলের সমন্বয়ে একটি সুসংহত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হলে শিক্ষার্থীকে একটি যৌক্তিক, নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় যা তাঁকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলে। সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য কিছু বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা প্রয়োজন :
    - **বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি :** বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় একটি কৌতূহলী মনের যা প্রতিটি শিশুর মধ্যে বিদ্যমান। পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা থাকা অত্যাবশ্যক, যা তাঁর অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে আরো বেশি শাণিত করে। আর এ দক্ষতাগুলোকেই বৈজ্ঞানিক দক্ষতা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেহেতু বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ শুধুমাত্র প্রমাণের ভিত্তিতেই গৃহীত হতে হয়, কাজেই নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার মত কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করাও সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালনার পূর্বশর্ত।

- **স্কেল, অনুপাত ও পরিমাণ :** যেকেনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে মাইক্রো বা ম্যাক্রো স্কেলের শর্তাবলি বিবেচনা করা জরুরি, কারণ অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় কী কী বিষয় প্রাসঙ্গিক তা অনেক সময় এই শর্তাবলির সাপেক্ষে ভিন্ন হতে পারে। অন্য দিকে, এই অনুসন্ধান পরিচালনা করতে বিভিন্ন পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ধরনের পরিমাণ পরিমাপ করার

দক্ষতা প্রয়োজন পড়ে। আবার এই স্কেল, অনুপাত ও পরিমাণের ভিন্নতা প্রকৃতির বস্তু বা ঘটনার উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে তাও বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। তাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য এবং বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ধারণাসমূহ অনুধাবন করার জন্য স্কেল, অনুপাত ও পরিমাণের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

- **সিস্টেম :** শিক্ষার্থী তাঁর অনুসন্ধানী চোখে দেখতে পায় তাঁর চারপাশ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাকার অণু পরমাণু এবং বৃহদাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবকিছুই এক একটি সিস্টেম, প্রতিটি বৃহৎ সিস্টেম আবার অসংখ্য সাবসিস্টেমের সমষ্টি। যেকোনো সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ সজীব এবং অজীব বস্তুসমূহের গঠন ও আচরণ, এর মধ্যকার বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া, সিস্টেম ও এর উপাদানসমূহের স্থিতি ও পরিবর্তন ইত্যাদির প্যাটার্ন ও কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করাই বিজ্ঞানের কাজ।
    - **গঠন ও আচরণ :** প্রকৃতির সজীব ও অজীব বস্তুসমূহের গঠন বিশ্লেষণ, এবং তার ভিত্তিতে তাদের আচরণ ও কার্যাবলি পর্যালোচনা।
    - **বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া :** কোন সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ বস্তু ও শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং তা কীভাবে সিস্টেমকে প্রভাবিত করে তার অনুসন্ধান।
    - **স্থিতি ও পরিবর্তন :** প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের স্থিতাবস্থায় থাকার শর্তাবলি এবং এর বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন বা বিবর্তনের অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ।

- **প্যাটার্ন :** প্যাটার্ন হচ্ছে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কোন বিষয় বা প্রাকৃতিক ঘটনার বার বার পুনরাবৃত্তি। প্রকৃতির বস্তু ও ঘটনাবলির প্যাটার্ন তাদের ধরন অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসব ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক উদঘাটন করা যায়।

- **কার্যকারণ সম্পর্ক :** যেকোনো প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনের কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রকৃতিতে কোন ঘটনা কেন ঘটে, কী ধরনের মিথস্ক্রিয়া এর পেছনে কাজ করে তার পরীক্ষালব্ধ ব্যাখ্যা বিশ্বপ্রকৃতি কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে সাহায্য করে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি ব্যখ্যা করতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। এর মধ্যে –

- **ভৌত বিজ্ঞান** হলো বস্তু ও বস্তু কণার গঠন আচরণ, মিথস্ক্রিয়া, স্থিতি ও পরিবর্তন সম্পর্কিত;
- **জীববিজ্ঞান** হলো সজীব উপাদানের গঠন আচরণ, মিথস্ক্রিয়া, স্থিতি ও পরিবর্তন সম্পর্কিত; এবং
- **পৃথিবী ও মহাকাশবিজ্ঞান** হলো পৃথিবী থেকে শুরু করে সমগ্র মহাবিশ্বের গঠন এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত।
- এই তিনটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র ছাড়াও আরেকটি প্রায়োগিক আলোচনার ক্ষেত্র হল **বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এবং সমাজ (Science, Technology & Society,** সংক্ষেপে **STS)**। প্রাত্যহিক জীবনে এবং মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিজ্ঞানের নানাবিধ প্রয়োগ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব – এসবই এখানে মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার ক্ষেত্রগুলো ঘিরে বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রম আবর্তিত হবে। অনুসন্ধানমূলক শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা গড়ে তোলা এই শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

- **বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা :** একটি বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতাসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলা বিজ্ঞান শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই শিক্ষাক্রমে তাই অনুসন্ধানমূলক শিখনের উপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা, প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। ফলাফলস্বরূপ, শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হবে এবং প্রাত্যহিক জীবনে, কিংবা যেকেনো সমস্যা সমাধানে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার প্রভাব পড়বে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে এই চর্চা শিক্ষার্থীর মাঝে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতার একটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে শিক্ষার্থীর মেটাকগনিটিভ দক্ষতাসমূহকে।
    - **মেটাকগনিশন :** মেটাকগনিশনকে সহজ ভাষায় বলা চলে Learning to learn; কী শিখবে, কীভাবে শিখবে, কীভাবে মূল্যায়িত হবে, অর্থাৎ সমগ্র শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থী পূর্ণ সচেতনভাবে নিজেই ব্যবস্থাপনা করবে এবং প্রতিফলনমূলক শিখনের দক্ষতা অর্জন করবে। অনুসন্ধানমূলক বিজ্ঞান শিখন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেটাকগনিটিভ দক্ষতাসমূহ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মেটাকগনিটিভ শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী জীবনব্যাপী শিখনের জন্য যোগ্য হয়ে ওঠে এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে নিজের পরবর্তী শিখনের দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।

- **বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক (Socio-scientific) মূল্যবোধ :** এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার কথা বার বার ব্যক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় শুধু বিজ্ঞান বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনায় নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। সেজন্য এই ফ্রেমওয়ার্কে বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় বিজ্ঞানমনস্কতার চর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্রস-ডিসিপ্লিনারি মূল্যবোধগুলো গড়ে তোলাও জরুরি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থী যাতে করে তার আশেপাশের পরিবেশ এবং তার উপর মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রভাবকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করে এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ ধারণ করার মাধ্যমে তারা বিজ্ঞানের দর্শনকে নিজের সংস্কৃতিতে আত্তীকৃত করতে পারবে, পাশাপাশি প্রকৃতি, পরিবেশ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে কৌতূহলী হবে, বৈচিত্র্যকে সম্মান করবে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক সকল ইস্যুর বিশ্লেষণে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দেবে; বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করবে এবং নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপলব্ধি করতে পারবে।

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ, নিরাপদ, নৈতিক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পারা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতা অর্জন করে প্রত্যাশিত ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৈরি হওয়া।

বিষয়ের ধারণায়ন

ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ের ধারণায়নের সময় এই বিষয়ের ব্যাপ্তি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। বরং বিষয়ের ধারণায়ন এমনভাবে করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থী শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকারীই হবে না বরং সে ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন করবে, ও তার সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের এবং পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য নিজস্ব ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন করতে পারবে। এর ফলে আইসিটি সক্ষমতার পাশাপাশি তার মাঝে ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতাও তৈরি হবে যা তাকে দক্ষ ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ডিজিটাল প্রযুক্তি *শিক্ষা* বিষয়টির ধারণায়নের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ডিজিটাল সাক্ষরতা, তথ্য সাক্ষরতা যার মূল অনুষঙ্গ। ডিজিটাল সাক্ষরতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সুসংবদ্ধ চিন্তন দক্ষতা অর্জন করবে যার সাহায্যে তারা নিজস্ব ডিজিটাল সলিউশন সৃষ্টি করতে পারবে। এক্ষেত্রে যে চিন্তনদক্ষতাসমূহকে এই ধারণায়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলো হল : কম্পিউটেশনাল চিন্তন, ডিজাইন চিন্তন ও সিস্টেম চিন্তন। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ ও সহযোগিতা, সৃজনশীল উদ্ভাবনের যোগ্যতা অর্জন করবে যা তার আইসিটি সক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

দক্ষ ডিজিটাল নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরো যে দুটি বিষয়ে ধারণা অর্জন করতে হবে তা হল : আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রেক্ষাপট। আইসিটি সক্ষমতা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতা দুইক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

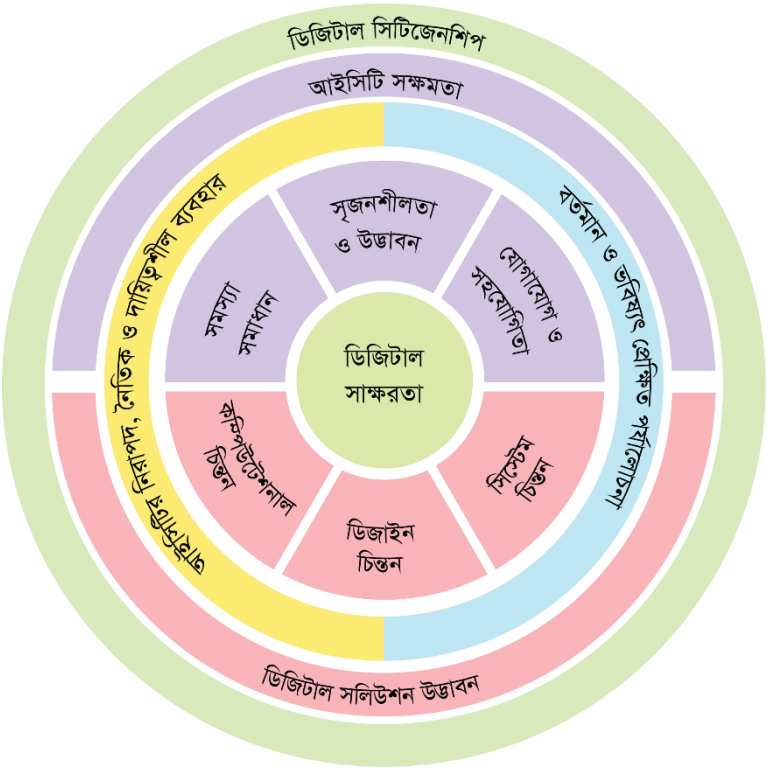

ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা বিষয়ের ধারণায়নে উঠে আসা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল।

ডিজিটাল সাক্ষরতা : বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি নির্ভর সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে জীবনধারণ করতে ডিজিটাল সাক্ষরতা অত্যাবশ্যক। ডিজিটাল সাক্ষরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ তথ্য সাক্ষরতা, তবে এর পরিধি আরো ব্যাপক। সুক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা ব্যবহার করে বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা, বিভিন্ন প্রয়োজনে দক্ষতার সঙ্গে উপযুক্ত প্রযুক্তির যথাযথ,

সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পারা, এবং নিজস্ব কনটেন্ট তৈরি ও উপস্থাপনও ডিজিটাল সাক্ষরতার অংশ। তথ্য সাক্ষরতা সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে নিচে আলোকপাত করা হল :

তথ্য সাক্ষরতা বলতে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য খুঁজে বের করা, তথ্যের নিরাপদ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা, তথ্য ও তথ্যের উৎসের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করাসহ তথ্য ব্যবস্থাপনার সকল দিককে বোঝায়। তথ্য সাক্ষরতা সকল মাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে আলোচনা করে, এখনকার সময়ে মিডিয়া লিটারেসি বা মিডিয়া সাক্ষরতা এর অন্যতম অনুষঙ্গ। ডিজিটাল মিডিয়ার বিশাল তথ্যভাণ্ডার এখন মানুষের কাছে উন্মুক্ত, মানুষের পছন্দ, অপছন্দ, মতামতের ওপর স্পষ্ট প্রভাব পড়ছে এসব ডিজিটাল মিডিয়ার। কাজেই যেকোনো মিডিয়া থেকে তথ্য নেবার আগে উৎস ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদির নির্মোহ বিশ্লেষণ করা জরুরি। একই সঙ্গে দরকার তথ্য ব্যবহার বা শেয়ার করার আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ইস্যুসমূহ বিবেচনা করে দায়িত্বশীল আচরণ চর্চা করা। তাছাড়া ডিজিটাল মিডিয়াকে শুধু তথ্য গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে না নিয়ে নিজস্ব কনটেন্ট তৈরি ও শেয়ারের প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি যেহেতু দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এসব প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও ব্যবহারিক দক্ষতা ছাড়া তাই তথ্য সাক্ষরতা অর্জন করা কঠিন। অন্য দিকে একবিংশ শতকে প্রযুক্তি ব্যবহারকারী হিসেবে শুধু নয়, বরং ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীরা যাতে উদ্ভাবকের ভূমিকা নিতে পারে সেটাও বিবেচ্য। আর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সৃজনশীল চিন্তা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যাতে কার্যকর ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন করতে পারে সেজন্যেও ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রয়োজন। এসব বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে যাতে ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন করতে পারে এবং জীবনব্যাপী এই দক্ষতা যাতে কাজে লাগাতে পারে সেই অনুযায়ী অর্জনউপযোগী যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে।

ডিজিটাল সাক্ষরতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে তাদের নিচের ডাইমেনশনগুলোতে ব্যাখ্যা করা যায় :

- **যোগাযোগ ও সহযোগিতা :** তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীকে এখন বলা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ, যেখানে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে যে-কেউ অন্য প্রান্তের কারো সঙ্গে মুহূর্তেই যোগাযোগ করতে পারে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও সমস্যা সমাধানের জন্য হোক বা অন্য যেকোনো সৃজনশীল কাজের জন্য হোক প্রযুক্তিনির্ভর এই পৃথিবীতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে যোগাযোগের সক্ষমতা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এক সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন। এই ক্ষেত্রে শুধু আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতাই যথেষ্ট নয়, বরং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপের জন্য উপযুক্ত যোগাযোগের মাধ্যম নির্ধারণ করে যোগাযোগের দক্ষতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।
- **সমস্যা সমাধান :** ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক প্রয়োজনে বা কোনো সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ও সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারার সক্ষমতা অর্জন করার উপরে এই রূপরেখায় বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। শুধু তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার নয়, বরং যেকোনো সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সবগুলো ধাপে যথাযথভাবে উপযুক্ত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- **সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন :** সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহারই শুধু নয়, বরং নিজস্ব কনটেন্ট তৈরি থেকে শুরু করে সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ করে ডিজিটাল সমাধান সৃষ্টি এই ধরনের যোগ্যতার অন্তর্গত।

- **কম্পিউটেশনাল চিন্তন :** ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জনের জন্য মূল যেই দক্ষতাগুলো প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল কম্পিউটেশনাল চিন্তন। এটি মূলত সমস্যা সমাধানের একটি সুসংবদ্ধ গাণিতিক চিন্তন প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে জটিল সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভেঙে আলাদা করা, তথ্য উপাত্ত যৌক্তিকভাবে সাজানো, সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করা, প্যাটার্ন খুঁজে বের করা ইত্যাদি।
- **ডিজাইন চিন্তন :** ডিজাইন চিন্তন ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ডিজাইন চিন্তন বলতে মূলত বোঝায় কোন সমস্যার সৃজনশীল, অভিনব ও কার্যকরী সমাধান উদ্ভাবন এবং তা যৌক্তিক মানদণ্ডের বিচারে যাচাই-বাছাই করার সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া।
- **সিস্টেম চিন্তন :** সিস্টেম চিন্তন বলতে মূলত বোঝায় কোনো সুনির্দিষ্ট সমস্যা ও তার প্রস্তাবিত সমাধান, সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটনের জন্য একটা সমন্বিত প্রয়াস। ডিজিটাল সিস্টেম কীভাবে কাজ করে, এর বিভিন্ন উপাদান ও তাদের মিথস্ক্রিয়া কীভাবে গোটা সিস্টেমকে প্রভাবিত করে, এবং ডিজিটাল সিস্টেমসমূহের পরিবর্তন সমাজ, অর্থনীতির উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে সেসবও এখানে বিবেচ্য বিষয়।

উপরে উল্লেখিত ডাইমেনশনগুলোতে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যে দুটি বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে হবে তা হল: আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট।

- **আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার :** তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে যোগাযোগ অভাবনীয় সহজ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু উল্টো দিকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন ঝুঁকি। এসব ঝুঁকি সম্পর্কে জানাই শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এই ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহারের দক্ষতা থাকাও জরুরি। মেধাস্বত্ব রক্ষার নৈতিক ও আইনি কাঠামো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ ও সামাজিক কাঠামোতে এর নানা প্রভাব সম্পর্কিত আইন ও নৈতিক কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা তাই দরকার। একই সঙ্গে প্রয়োজন ব্যক্তিগত পরিচয়, গোপনীয়তা এবং অনুভূতি, রীতি-নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করা।

- **বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা :** ডিজিটাল সক্ষমতা অর্জন করতে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চাহিদা, প্রাপ্যতা, ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনা যেমন জরুরি, তেমনি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কীভাবে প্রভাবিত করে সেটিও পর্যালোচনা করা জরুরি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল; আর এ পরিবর্তনশীলতা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকেও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে সমাজে একদিকে যেমন কিছু ঝুঁকি তৈরি হয় তেমনি নতুন প্রযুক্তির কারণে উন্মোচিত হয় নতুন সম্ভাবনার দ্বার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলা করে প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানোর দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা প্রয়োজন। গত শতকের শেষভাগে ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবনের পর থেকে তথ্যপ্রযুক্তি যে গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাতে এই সক্ষমতা অর্জনের জন্য শুধু বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা যথেষ্ট নয়। বরং অর্জিত যোগ্যতার প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এই প্রেক্ষাপট কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে কর্মজগতে তার কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা দুরকম সক্ষমতা অর্জন করবে, সেগুলো হল : আইসিটি সক্ষমতা এবং ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন।

- **আইসিটি সক্ষমতা :** বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বড় অংশের মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে এই অভ্যস্ততা বেড়ে চলেছে। তাই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহে দৈনন্দিন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শেখার দক্ষতার চেয়ে এখন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে দৈনন্দিন জীবনে তথ্য-প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, কার্যকর ও পরিমিতভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করা।
- **ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন :** একবিংশ শতকের বাস্তবতা সামনে রেখে ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার একটি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি সক্ষমতা গড়ে তোলা, সেই সূত্র ধরে এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও অভিনব ডিজিটাল সলিউশন সৃষ্টির সক্ষমতা অর্জনের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর ফলে সে শুধু বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারবে তা-ই নয়, বরং পরবর্তী জীবনেও তার বিভিন্ন সম্ভাবনার দরজা খোলা থাকবে।

ডিজিটাল সিটিজেনশিপ : উপর্যুক্ত সকল বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যাতে ডিজিটাল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এই রূপরেখায়। একটি ডিজিটাল সমাজে শিক্ষার্থী যাতে দক্ষতার সঙ্গে নিজের অবস্থান করে নিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ডিজিটাল সিটিজেনশিপকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। একজন ডিজিটাল নাগরিক যেসব দিক দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

- ডিজিটাল সাক্ষরতা
- ডিজিটাল সলিউশন সৃষ্টি
- ভার্চুয়াল পরিচিতি (digital footprint)
- ডিজিটাল সিস্টেমে প্রাইভেসি ও নিরাপত্তা
- ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার
- ডিজিটাল মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ
- সাইবার অপরাধ
- বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও মেধাস্বত্ব

প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি আলাদা বিষয় আকারে থাকছে না, তাই এই স্তরের সকল শিখন যোগ্যতা ক্রস কাটিং হিসেবে গণিতসহ অন্যান্য সকল বিষয়ের শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হবে।

বিষয় : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্বে নিজের অবস্থান, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও কাঠামো পর্যালোচনা করে পরিবর্তনশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করে একটি উন্নত, নিরাপদ ও টেকসই বাংলাদেশ ও বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বনাগরিক হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীর একজন বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। প্রকৃতিতে ও সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা পরিবর্তনের কার্যকারণ ও প্রভাব অনুসন্ধান করতে পারবে। যৌক্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধানের যোগ্যতা অর্জন করবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে সচেতন নাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মূলনীতির আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচার নীতি ধারণ করে সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসেবে রূপরেখায় নির্ধারিত দশটি মূল শিখনক্ষেত্রের সবগুলোরই নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখলেও, এতে মূলত সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, পরিবেশ ও জলবায়ু এবং জীবন ও জীবিকা শিখন-ক্ষেত্রগুলো অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও এসকল শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতাসমূহ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

সামাজিক বিজ্ঞানের বৃহত্তর পরিসরে যে সকল বিষয় যেমন- ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি অধ্যয়ন করা হয়, সেগুলোর মূল বিষয়বস্তুসমূহ বিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয়, প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো, পরিবর্তনশীলতায়

ভূমিকা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা – এই চারটি মূল ডাইমেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এই চারটি ডাইমেনশনকে ভিত্তি করেই বিষয়ের ধারণায়ন করা হয়েছে।

ধারণায়ন অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী সামাজিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন দৃশ্যমান ও বিমূর্ত কাঠামো এবং এসব কাঠামোর কাজ ও মিথস্ক্রিয়া বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করবে। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে নিজস্ব ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সে তার আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি সে অনুধাবন করবে যে চারপাশের সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং তাদের ভূমিকা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনশীলতার ফলে নিয়তই কিছু সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি তৈরি হয়, যা প্রকৃতি ও সমাজকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। একজন শিক্ষার্থী এসব ঝুঁকি মোকাবিলা করে সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি ও সমাজের পরিবর্তনশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা পালনের যোগ্যতা অর্জন করবে। মানবসভ্যতার বিকাশে সম্পদ একটি অপরিহার্য উপাদান। কাজেই টেকসই উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জরুরি। তাই সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। আলোচ্য চারটি ডাইমেনশনের আলোকে একজন শিক্ষার্থী যে যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে তা সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সামাজিক সম্পর্ক, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য এসকল ক্ষেত্রে চর্চা করার মাধ্যমে সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, দায়িত্বশীলতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অর্জন করতে পারবে। আর এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে যে যোগ্যতা অর্জিত হবে তার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে জাতীয়তাবোধসম্পন্ন বিশ্বনাগরিক।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করার জন্য যে চারটি ডাইমেনশন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে :

আত্মপরিচয়

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের পরিচয় নির্মাণ করা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের একটি মূল প্রতিপাদ্য হওয়ায় সকল বিষয়কে সমন্বিতভাবে আয়ত্ত করার জন্য একে একটি ডাইমেনশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

প্রাকৃতিক সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয়েরই কেন্দ্রীয় একটি বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাঠামোর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাই কাঠামোকে একটি ডাইমেনশন হিসেবে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রাকৃতিক কাঠামো বলতে সাধারণত প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও ব্যবস্থা যেমন : নদী, সাগর, মহাসাগর, পর্বতমালা, মহাদেশ প্রভৃতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। অন্য দিকে, সামাজিক কাঠামো বলতে সাধারণত পরিবার, ধর্ম, রীতিনীতি, সংস্কৃতি,গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে বোঝানো হয়।

পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার বস্তুনিষ্ঠ প্যাটার্ন অনুসন্ধান করা সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষয়। যে কোন পরিবর্তনের ফলেই কিছু সম্ভাবনা ও ঝুঁকি তৈরি হয়। এই ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে যথাযথ ইতিবাচক ভূমিকা নির্ধারণের যোগ্যতা অর্জন সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এ বিবেচনায় পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা নির্ধারণকে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের যোগ্যতা নির্ধারণের একটি ডাইমেনশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

উন্নয়নের জন্য সম্পদ একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রকৃতির সম্পদ সীমিত। প্রকৃতিকে ব্যবহার করে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ অর্থাৎ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণকে তাই ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের একটি ডাইমেনশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিষয়ঃ জীবন ও জীবিকা

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

পরিবর্তনশীল কর্মজগত, কর্মের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সকল কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন করা, কর্মজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে দৈনন্দিন কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাক-যোগ্যতা, কর্মজগতের উপযোগী প্রায়োগিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা, কর্মজগতে ঝুঁকিমুক্ত ও সুরক্ষিত থেকে ভবিষ্যৎ দক্ষতায় অভিযোজন করতে পারা এবং সকলের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অবদান রাখতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রার ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে জীবিকা বদলে যাচ্ছে, নিত্য নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বর্তমান বিশ্ব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছে। পূর্বে মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, বিগডাটা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো টেকনোলোজি, থ্রি-ডাইমেনশন প্রিন্টার, জেনেটিক্সসহ একুশ শতকের আরো অনেক প্রযুক্তি আলাদাভাবে বিকশিত হতে থাকলেও বর্তমানে এই প্রযুক্তিসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে এমনভাবে দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে যা পুরো বিশ্ব ব্যবস্থাকেই নতুন করে বিন্যস্ত করছে। এ কারণে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ভবিষ্যতের শিল্পবিপ্লবের ধাক্কায় বদলে যাওয়া কর্মজগতে আগামী প্রজন্মের টিকে থাকা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা ও কর্মযোগ্যতা তৈরি করা জরুরি।একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে- *যে শিশুরা আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, তাদের ৬৫% কর্ম জগতে প্রবেশ করবে এমন একটি কাজ বা চাকুরি নিয়ে, যে কাজের বা চাকুরির কোনো অস্তিত্বই বর্তমানে নেই*[৪]। এরকম দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অজানা বিশ্বকে বিবেচনা করে, আজকের শিক্ষার্থীদের, তাদের কর্মজগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের নিমিত্তে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টির নকশা প্রণয়ন করা হয়।

ব্যানবেইস ২০১৯ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পূর্বে প্রায় ১৮% শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি সমাপ্তের আগে মাধ্যমিক শিক্ষাথীর প্রায় ৩৮% এবং দ্বাদশ শ্রেণি সম্পূর্ণ করার পূবেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীর প্রায় ২০% শিক্ষার্থী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়ে।[৫] অথাৎ গড়ে প্রায় ৭০% শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণি সম্পূর্ণ করার পূর্বেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং কোনোরকম পেশাগত প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আবার উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক সমাপ্তির পরও অনেক সংখ্যক শিক্ষার্থী বেকার থাকে। এর পেছনে কারণ হিসেবে দেখা গেছে কর্মজগতের চাহিদা অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দক্ষতার ঘাটতি।[৬] তাই সাধারণ শিক্ষাধারার সকল শিক্ষার্থীই মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শেষে যেন পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে শ্রমবাজারে সরাসরি যুক্ত হতে পারে এই লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষাধারায় 'জীবন ও জীবিকা' নামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যত কর্মজগতে প্রবেশের জন্য নিজেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে পরিবর্তনশীল শ্রমবাজার বিবেচনায় নিয়ে সঠিকভাবে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করতে পারবে। সে লক্ষ্য বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি একুশ শতকের উপযোগী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে। কর্মজগতে প্রবেশের

---

[4] The World Economic Forum, 2016, "The Future of Job" https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/

[5] BANBAEIS 2019

[6] World Bank (2018), " Bangladesh Skills for Tomorrow's Jobs: preparing youth for a fast-changing Economy"

জন্য রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা (ট্রান্সফারেবল স্কিল) ও বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নিজ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের কাছে তার দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করে তার উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সচেষ্ট হবে।

এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরি এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজ করার সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। জীবন ও জীবিকা বিষয় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে এবং তা কাজে লাগিয়ে আগামীতে শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যে কোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারবে।

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য চারটি ডাইমেনশন নির্ধারন করা হয়:

আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়ন: ভবিষ্যত বিশ্বের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে নিজেকে জানা সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। নিজেকে জানার মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা-মন্দলাগা সম্পর্কে নিজে জানবে সেই সাথে নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে এবং নিজের দুর্বলতা ও নিজের উন্নয়নের ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের মাধ্যমে নিজের উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা বহাল রাখতে পারবে। মানুষ সেই পেশায় সবচেয়ে ভালো করে যে পেশায় কাজ করতে সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। তখন কাজকে সে আরো বেশি উপভোগ করতে পারে। এজন্য আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়নকে একটি ডাইমেনশন হিসেবে এখানে ধরা হয়েছে। একই সাথে ইতিবাচক আত্মসম্মানবোধের উন্মেষ ঘটানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজ, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে; নিজের কাজ, পরিবারের কাজ, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব, সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং (কর্মজীবন পরিকল্পনা): নিজেকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সিস্টেমেটিক উপায়ে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে ভবিষ্যত পেশা নির্বাচন করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তাকে নিজের আগ্রহ, ঝোঁক, দক্ষতা বিবেচনা করে, পরিবর্তশীল বিশ্বে শ্রমবাজারের ওপর ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব এবং পারিবারিক সক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একটি কার্যকর কর্মজীবন পরিকল্পনা করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও অজানা ভবিষ্যত বিবেচনা করে পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে যে কোনো পরিস্থিতিতে তা পরিমার্জন বা পরিবর্তন বা সময়ের সাথে সাথে সমন্বয় করা যায়।

পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনার পাশাপাশি এমন একটি দক্ষতা অর্জন করতে পারে যাতে শিক্ষা সমাপান্তে কর্মক্ষেত্রের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে অথবা কোনো একটি নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করতে পারে। কারিগরী শিক্ষার সংগে সমন্বয় করে যেকোনো একটি বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) বিষয়ের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা: বিশ্বায়ন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, ডেমোগ্রাফিক রূপান্তরের ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি মুহূর্তে বৈশ্বিক পরিবর্তনের চলমান প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক পুরোনো পেশার সমাপ্তি ঘটছে। ভবিষ্যত নতুন পেশার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ রাখতে ভবিষ্যত কর্মদক্ষতা একটি ডাইমেনশন হিসেবে রাখা হয়েছে। অজানা পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে নিজেকে হালনাগাদ রাখা ও জীবনব্যাপী শিখনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নতুন পেশার জন্য আবশ্যিক সুনির্দিষ্ট দক্ষতাসমূহ সম্পর্কে যেহেতু আমরা জানিনা তাই একুশ শতকের দক্ষতাসমূহ বিশেষত সুক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, কোলাবোরেশন বা দলে কাজ করার দক্ষতা, সৃজনশীল দক্ষতা ও যোগাযোগ দক্ষতাসমূহ অর্জনের সুযোগ থাকবে।

প্রতিটি ডাইমেনশনে দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন এবং নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এই বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অনুধাবনের পাশাপাশি দৈনন্দিন কর্ম অনুশীলন করে ব্যবহারিক কাজের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং জীবনঘনিষ্ট কর্মকান্ডের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করবে। বিষয়টির পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীই কোনো একটি পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারে। স্থানীয় চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিদ্যালয় বা শিক্ষার্থীর নিজ এলাকায় উপার্জন সংশ্লিষ্ট কাজে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা উদ্যোক্তা হিসেবে বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপান্তে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে, বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) কোর্স সংশ্লিষ্ট কোনো একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে সরাসরি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে অথবা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে।

প্রাথমিক স্তরে জীবন ও জীবিকা কোনো আলাদা বিষয় নয় কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বিষয়ের যোগ্যতার বুনিয়াদ প্রাথমিক স্তর থেকেই নির্মিত হতে থাকবে। প্রাথমিক স্তরে জীবন ও জীবিকা বিষয় ক্রসকাটিং হিসেবে 'ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান' ও 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা' বিষয়ের সাথে যৌক্তিকভাবে সন্নিবেশ করা হবে যার প্রতিফলন অন্যান্য বিষয়েও থাকতে পারে।

বিষয়: ধর্ম শিক্ষা

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

ধর্মের মৌলিক জ্ঞান, বিশ্বাস ও জ্ঞানের উৎসসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন ও ধারণ করতে পারা। সৃষ্টিজগতের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বপালন এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং ধর্মীয় জ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধিবিধান ও অনুশাসন উপলব্ধি করে তা নিজ জীবনে অনুশীলন করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধর্ম এক দিকে যেমন জীবনের অর্থ, মূল্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে তেমনি নিজেকে ও অন্যকে বুঝতেও সহায়তা করে । নিজেকে সৎ, নীতিবান, দায়িত্বশীল, দয়ালু ও মানবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত রেখে সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক, শুদ্ধ মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করতে ধর্মের নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করা জরুরি যা সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে অপব্যাখ্যা করে কেউ যেন মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে কিংবা কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি করতে না পারে তার জন্যও সঠিকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা জরুরি। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সঠিকভাবে ধর্মশিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ধর্মশিক্ষা বিষয়টিকে তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষেত্রের মাধ্যমে ধারণায়ন করা হয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় বিধিবিধান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষেত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় এবং এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়া হবে – যা সার্বিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষার যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে।

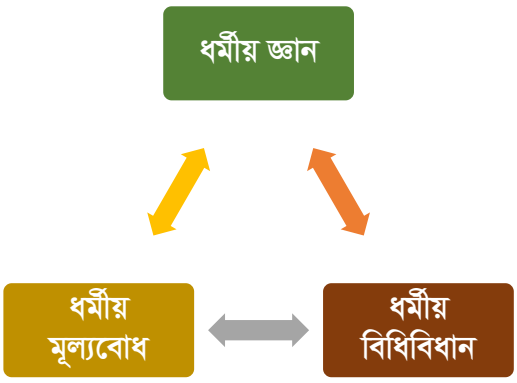

ধর্মীয় জ্ঞান	ধর্মীয় মৌলিক জ্ঞান ও বিশ্বাস, জ্ঞান আহরণে আগ্রহ ও জ্ঞানের উৎস, জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি, জ্ঞানের ব্যবহার ও প্রয়োগ
ধর্মীয় বিধিবিধান	ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার জেনে ও উপলব্ধি করে চর্চা করা, ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য অনুধাবন
ধর্মীয় মূল্যবোধ	প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয় আচরণ গ্রহণ ও চর্চা এবং নিন্দনীয় আচরণ বর্জন

ধর্মশিক্ষা বিষয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিবিধানের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও চর্চায় অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে স্থিতিশীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ সুখী সমাজ তথা বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব যা শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রাধান্য পেয়েছে।

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Well Being)

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

বয়সভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং এর চ্যালেঞ্জ সঠিকভাবে মোকাবেলা করে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও সুরক্ষিত থেকে নিজে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা। নিজের ও অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পারবারিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক পরিসরে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সক্রিয় ও মানবিক নাগরিক হিসেবে অবদান রাখা ।

বিষয়ের ধারণায়ন

অন্তঃ ও আন্তঃব্যক্তিক পরিবর্তন এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নিজ স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সকলকে নিয়ে ভালো থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিজে ভালো থাকার এবং অন্যকে ভালো রাখার উপর মানুষের স্বপ্ন ও ভবিষ্যত জীবন অনেকাংশে নির্ভর করে যা সুস্থ সমাজ এবং নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিপূর্বে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত যোগ্যতাসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ কিংবা সহ বা অতিরিক্ত শিক্ষাক্রমিক কাজ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। কিন্তু অন্তঃ ও আন্তঃব্যক্তিক পরিবর্তনের প্রভাব পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা করে সকলকে নিয়ে ভালো থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকের কিছু বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এই যোগ্যতাসমূহ আপনা-আপনি তৈরি হয় না, বরং শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষা ও পরিচর্যার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জিং, উপভোগ্য, সমসাময়িক, সক্রিয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা নিজের এবং অন্যের বৈশিষ্ট্য, সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা, আবেগ, অনুভূতি পছন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণার ভিত্তিতে নিজেকে বুঝে এবং অন্যের অবস্থান অনুধাবন করে ইতিবাচক, কার্যকর যোগাযোগ ও সম্পর্ক ব্যবস্থাপনাসহ তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে নিয়ে সফল ও আনন্দময় জীবনযাপন করতে পারে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়টি ধারণায়নে প্রতিক্রিয়াভিত্তিক (Reactive) উদ্যোগের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতায়ন (Empowerment) কৌশল বিবেচনা করা হয়েছে যা সময়সাপেক্ষ হলেও শিক্ষার্থীদের কঠিন বাধা দূর করে ভিতর থেকে আত্মবিশ্বাসী ও মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে টিকে থাকতে (resilient) সহায়তা করে। এ সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজের ও অন্যের আবেগ ও অনুভূতি অনুধাবন করে ভাব বিনিময় ও মত প্রকাশ, কার্যকর অংশগ্রহণ, আত্মবিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা (বজায় রাখা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছিন্ন করা), সফলতা ও ব্যর্থতা অনুধাবন ও ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা, আবেগ ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা সর্বোপরি আত্ম-পরিচর্যার মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ, সংবেদনশীল ও পরিশীলিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানুষ, সমাজ ও পৃথিবীর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা অন্যের আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ, বেদনা অনুধাবন করে সমব্যথা বা সম-আনন্দ অনুভব করে এবং সকল প্রকার ঝুঁকি, দ্বন্দ্ব, হতাশা, ক্ষোভ, বিদ্বেষ নিরসনের মাধ্যমে মানব ও প্রকৃতি সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে অর্থবহ জীবনযাপনের মাধ্যমে ভালো থাকতে পারে।

বিষয়ের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় নিম্নলিখিতভাবে এর ধারণায়ন করা হয়েছে।

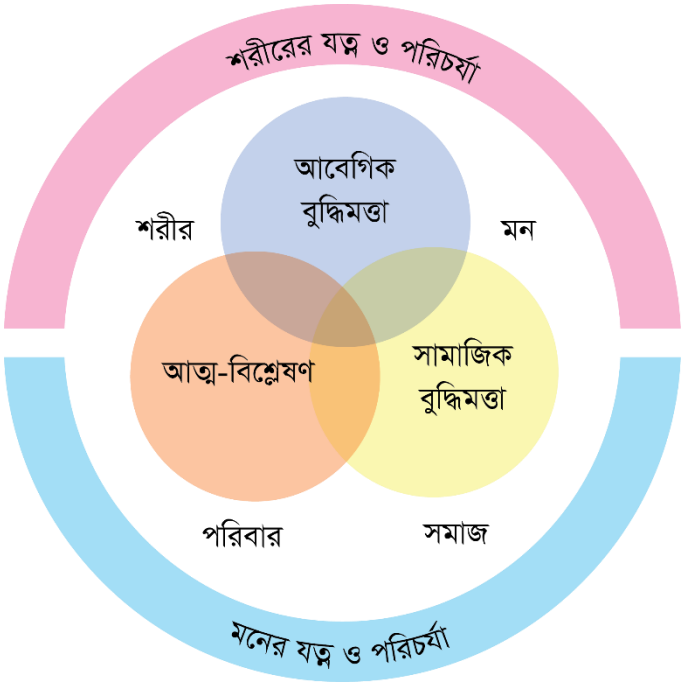

শরীর ও মনের যত্ন ও পরিচর্যা: স্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হলো নিজের পরিচর্যা অর্থাৎ নিজেকে ভালোবেসে শরীর ও মনের যত্ন ও পরিচর্যা করা। শিক্ষার্থীর শরীর, মন এবং পরিবেশের প্রতিনিয়ত অন্তঃ ও আন্তঃ মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির স্বাস্থ্যকর, ইতিবাচক, সংবেদনশীল ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিনিয়ত নিজের যত্ন ও পরিচর্যা করা প্রয়োজন। সুতরাং নিরবিচ্ছিন্নভাবে আত্ম-পরিচর্যা করতে পারার যোগ্যতা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য অত্যাবশ্যক। **দৈনন্দিন এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা, রোগ ও দুর্ঘটনা, ঝুঁকি মোকাবেলা, আবেগ ব্যবস্থাপনা, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, চাপ মোকাবেলা, শখ ও বিনোদন, অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবা ইত্যাদি সার্বিকভাবে আত্ম-পরিচর্যার অংশ**। আত্ম-পরিচর্যায় শরীর ও মনের সঙ্গে পরিবার ও সমাজের মিথস্ক্রিয়ার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই নিজে ভালো থাকার অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে অন্যকেও ভালো রাখা। যথাযথভাবে জেনে, বুঝে, অনুধাবন ও উপলব্ধি করে কার্যকরী আত্ম-পরিচর্যা করতে হলে নিম্নবর্ণিত সক্ষমতাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. **আবেগিক বুদ্ধিমত্তা** : নিজের আবেগ অনুভূতির অনুধাবন ও উপলব্ধি, ইতিবাচকভাবে প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনাসহ অন্যের আবেগ ও অনুভূতি বোঝা এবং তা সম্মান করে যৌক্তিক ও স্বাস্থ্যকর যোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা এবং ধৈর্য্য ও সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করার যোগ্যতা এই ধরণের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত। চিন্তাকে যৌক্তিক, বিশ্লেষণধর্মী ও গঠনমূলক রেখে, প্রাধিকার নির্ধারণ করে ইতিবাচকভাবে ভূমিকা রাখতে পারাও এই যোগ্যতাসমূহের অংশ।

২. **আত্ম-বিশ্লেষণ** : নিজের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক মুল্যায়নের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ, মূল্যায়নকে বিশ্লেষণধর্মী ও গঠনমূলক রেখে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া, অনুভূতি ও আচরণের সঙ্গে সম্পর্ক এবং প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ সহায়তা চাইতে পারা ইত্যাদি এই ধরনের যোগ্যতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **সামাজিক বুদ্ধিমত্তা** : সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে সকলের সংগে থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখা এবং নিজের কার্যক্রম ও ভূমিকায় সন্তুষ্ট থেকে নিজেকে শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসতে পারার জন্য সামাজিক বুদ্ধিমত্তা সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের এবং অন্যের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে যৌক্তিকভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক গঠন ও বজায় রাখা, আন্তঃ সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও চাপ মোকাবেলা/ব্যবস্থাপনা, ধৈর্য্য ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে আবেগ ও চাপমুক্ত থেকে দৃঢ়তা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও নমনীয়তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিরসন ও সমঝোতা করতে পারা এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক বজায় রাখতে পারা সামাজিক বুদ্ধিমত্তার অন্যতম যোগ্যতা।

সুতরাং শরীর, মন, পরিবার ও সমাজের প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে আবেগিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্লেষণ এবং সামাজিক বুদ্ধিমত্তা অর্জন করে নিজেকে ভালোবেসে নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শরীর ও মনের যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভালো থাকার এবং অন্যকে ভালো রাখার যোগ্যতা অর্জন করবে।

বিষয়: শিল্প ও সংস্কৃতি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক অবলোকন, অনুভব করে প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ তৈরি এবং পারস্পরিক রূপান্তরের মাধ্যমে শিল্পকলার অন্তর্গত দৃশ্যকলা ও উপস্থাপনকলার বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য, ইত্যাদি) ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে আনন্দ উপলব্ধি করতে পারা এবং সেসবের চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারা; সংবেদনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ সাধন করতে পারা; নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন এবং অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারা, শিল্পকলাকে উপজীব্য করে উচ্চতর শিক্ষা বা আত্মনির্ভরশীল হতে শিল্পকলার যেকোনো ধারাকে বিবেচনা করতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

নিজস্ব জাতিসত্তার ঐতিহ্যবাহী রূপকে নান্দনিকভাবে বিশ্বজনীন করে তোলার জন্য শিল্প ও সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতি শিল্প ও সংস্কৃতি নির্ভর শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে পৃথিবীব্যাপী তুলে ধরেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেদের শিল্পবোধ ও নান্দনিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নান্দনিকবোধসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিল্প ও সংস্কৃতি যথাযথভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করার গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্পের ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। গুহাযুগ থেকে পৃথিবীর সকল সভ্যতার পথ ধরে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিল্প ও সংস্কৃতি মানুষের জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। রেনেসাঁর সময় শিল্প ও সংস্কৃতি-নির্ভর জীবনদর্শন ইউরোপকে দিয়েছিল এক অনন্য উচুঁমাত্রা। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারে নান্দনিকবোধসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতেও শিল্প ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। যে জাতি নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসে সে অন্যের সংস্কৃতিকেও সম্মান করে। শিল্প ও সংস্কৃতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে সংবেদনশীল, মানবিক গুণাবলি ও পরমতসহিষ্ণু নতুন প্রজন্ম তৈরির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সৃজনীগুণসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল রূপে গড়ে তোলাকে শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দময় করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের নান্দনিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো শিল্প ও সংস্কৃতি । শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীল চিন্তার সঠিক বিকাশও মূল্যায়ন করা যায়। এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিল্প ও সংস্কৃতিকে শিখন-ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করার উদ্দেশ্য হলো শিল্পকে উপজীব্য করে শিশুদের সঠিক মনোবিকাশে সহায়তা করা।

শিল্প ও সংস্কৃতি শিখন-ক্ষেত্রটিকে এমন একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ও সাহিত্য) চর্চার সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী একজন নান্দনিক, রুচিশীল ও শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে এবং জীবন যাপন করতে পারবে। শিক্ষার্থীর ইচ্ছা ও প্রয়োজনবোধে সৃজনশীল সক্ষমতাকে উচ্চতর শিক্ষা, কর্মজগৎ বা আত্মনির্ভরশীল হতে বিবেচনা করারও সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শ্রেণি এবং জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে শিল্প ও সংস্কৃতিকে মাধ্যম

হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সূত্রে তাদের অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরিতেও শিল্পবোধকে কাজে লাগানোর চিন্তা করা হয়েছে।

এজন্য শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টিতে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত সৃজনশীলতার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা হয়েছে যেখানে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরকেই শিল্প ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ না করে প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি-নির্ভর করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে লোকজ, প্রাকৃতিক উপাদান ও উপকরণ ব্যবহার করে শিশুদের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। শিশুদের কল্পনাপ্রবণ, অনুসন্ধিৎসু মনোজগতকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে উদার, সংবেদনশীল, নান্দনিকবোধ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকৃতি পাঠ, শিল্প ও সংস্কৃতি-নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সমসাময়িক বিশ্বের সৃজনশীল শিক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে সামনে রেখেই এই শিল্প ও সংস্কৃতি এর সমন্বিত শিখন বিষয়টি পরিকল্পনা করা হয়েছে। যার পদ্ধতিটি হবে নিম্নরূপ :

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র অবলোকন, অনুভব ও প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ তৈরি

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্রকে অবলোকন ও অনুভব করে (দেখে, শুনে, স্পর্শ ও অনুধাবন করে) শিল্পের উপাদান হিসেবে আকার, আকৃতি, রং, সুর, তাল, লয়, ছন্দ ইত্যাদি অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করা এবং তার প্রতিলিপি ও প্রতিরূপ তৈরি।

রূপান্তর

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র অবলোকন ও অনুভব করে শিল্পের উপাদানসমূহের নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ।

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের ধারণা ও যোগ্যতার দৈনন্দিন কাজ ও বিশেষত্ব তৈরিতে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ।

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

যাপিত জীবনে নান্দনিকতার মাধ্যমে মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও গুণাবলির বিকাশ (জাতীয়তা, বিশ্ব-নাগরিকত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবিকতা, বৈচিত্রকে সম্মান, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি)।

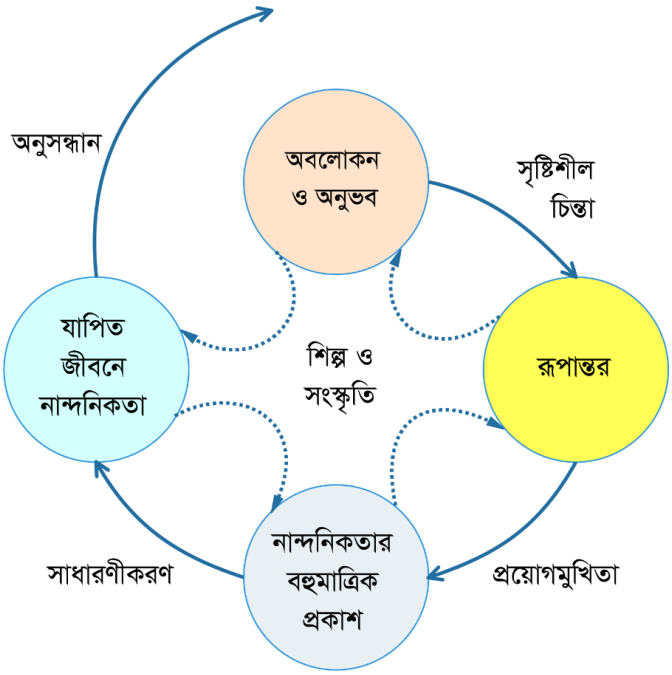

২.১২ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি)

ব্যক্তি তাঁর চারপাশের প্রকৃতি,পরিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতির বাইরে পৃথক কোনো সত্তা নয় বরং এসব কিছুর মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠা একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তাই শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পাশাপাশি কর্মজীবনের সঙ্গেও শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করতে হবে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরের শেষ পর্যায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি। এই স্তরের শিক্ষার্থীর বয়স সাধারণত ১৬ থেকে ১৮ বছর। শিক্ষার্থীর জীবনে এই দুইটি বছর অন্তবর্তীকাল হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ এই পর্যায় শেষে শিক্ষার্থী স্নাতক বা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়, আবার একটি বড় অংশের শিক্ষার্থী কর্মজগতে প্রবেশ করে। তাই যারা স্নাতক স্তর কিংবা কর্মজগতে প্রবেশ করবে তাঁদের জন্য এ স্তরের শিক্ষাক্রম এমনভাবে বিন্যস্ত করা হবে যেন তাদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি উচ্চ শিক্ষা এবং ভবিষ্যত কর্মজগতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। পাশাপাশি পরিবর্তনশীল বিশ্বে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যাতে সে ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে সেই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে।

২.১২.১ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় নির্ধারণ

এই স্তরকে বিশেষায়নের জন্য প্রস্তুতির স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই স্তরে অনেক শিক্ষার্থীকে যেমন উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় আবার অনেক শিক্ষার্থীকে পরিস্থিতি বিবেচনায় কর্মজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে যেন সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ব্যক্তিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যাতে সে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে সে উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য এই স্তরে আবশ্যিক একাধিক বিষয় থাকবে। প্রতিটি আবশ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম রূপরেখায় চিহ্নিত এক বা একাধিক শিখন-ক্ষেত্রের প্রতিফলন থাকবে।

যেহেতু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিখনের সার্বিক উদ্দেশ্য বিশেষায়নের জন্য প্রস্তুতি তাই নৈর্বাচনিক বিশেষায়িত বিষয়সমূহের জন্য এই স্তরে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শিক্ষার্থী তাঁর আগ্রহ, সামর্থ্য ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনটি বিশেষায়িত বিষয় নির্বাচন করতে পারবে।

জীবন ও জীবিকা শিখন-ক্ষেত্রের আলোকে শিক্ষার্থীরা যেন আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয় তার জন্য পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রায়োগিক বিষয়সমূহ নির্বাচন করা যাবে। নির্বাচিত প্রায়োগিক বিষয়সমূহ থেকে ঐচ্ছিক হিসেবে যেকোনো একটি বিষয় নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির জীবন ও জীবিকা বিষয়ে কর্মজীবনের পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত বয়সোপযোগী যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে তাদের আগ্রহ, ইচ্ছা, সক্ষমতা অনুযায়ী ভবিষ্যতের পরিকল্পনার মাধ্যমে বিষয় ও পথ নির্ধারণ করতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে নিচে দেয়া হলো

- **আবশ্যিক বিষয় :** একাধিক শিখনক্ষেত্রসমূহের ভিত্তিতে নির্ধারিত ৩ টি বিষয় যা সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক হবে।
- **নৈর্বাচনিক বিষয় :** প্রচলিত সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষার নৈর্বাচনিক, আবশ্যিক বিষয়সমূহ উন্মুক্ত রেখে বা প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বিষয়গুচ্ছ নির্বাচন করা যেতে পারে। নির্বাচিত বিষয়গুচ্ছ থেকে একজন শিক্ষার্থীকে তার আগ্রহ ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী যেকোনো তিনটি বিষয় নির্বাচন করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

- **প্রায়োগিক বিষয় (ঐচ্ছিক) :** পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত বিষয়সমূহ থেকে শিক্ষার্থীকে তার আগ্রহ ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী যেকোন একটি বিষয় বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

২.১২.২ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির আবশ্যিক, নৈর্বাচনিক এবং প্রায়োগিক বিষয়সমূহের প্রকৃতি ও বিন্যাস

একাদশ দ্বাদশ শ্রেণিতে মোট ভরের তিন চতুর্থাংশ বিশেষায়িত বিষয়সমূহের জন্য এবং এক চতুর্থাংশ ভর আবশ্যিক বিষয়সমূহের জন্য বরাদ্দ থাকবে। এই পর্যায়ে বিশেষায়িত বিষয়সমূহ যেহেতু বেশি প্রাধান্য পাবে, সেহেতু এ বিষয়সমূহের বিন্যাস এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যিক বিষয়সমূহের প্রকৃতি ও পরিসর নির্দিষ্ট করার পরে বিষয়ভিত্তিক শিখনযোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করা হবে। আবশ্যিক এক বা একাধিক বিষয়ে বিভিন্ন শিখন-ক্ষেত্রের সমন্বয় থাকতে পারে।

- আবশ্যিক বিষয়সমূহ কোন নির্দিষ্ট শিখনক্ষেত্রভিত্তিক না হয়ে বরং বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের নির্বাচিত শিখনযোগ্যতার সমন্বয়ে উন্নয়ন করা যেতে পারে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত নির্দিষ্ট শিখনক্ষেত্র বা বিষয়ের প্রাধান্য রেখে বিষয়সমূহ যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়সমূহ তা না হয়ে বরং বৈচিত্রময় হবে বিধায় রূপরেখার বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রমে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিখনযোগ্যতাসমূহ উল্লেখ করা হয়নি। তবে পরবর্তীতে এই বিষয়গুলোর শিখনক্রম বিন্যাসের সময় দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের অর্জিতব্য শিখনযোগ্যতাসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
- নৈর্বাচনিক বিষয়ের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে তার আগ্রহ ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী যেকোনো তিনটি বিষয় নির্বাচন করার সুযোগ দেয়া হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কোন একটি নৈর্বাচনিক বিষয়ের শিখনযোগ্যতা প্রণয়নের সময় দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের অর্জিত শিখনযোগ্যতাসমূহ এবং ঐ বিষয়ের প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় যোগ্যতাসমুহ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট নৈর্বাচনিক বিষয়ের গভীরতা ও পরিসর বিন্যাস করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের পুর্বজ্ঞানের সাথে যৌক্তিক সমন্বয় করতে পারে, একইসাথে পরবর্তী উচ্চশিক্ষার সাথেও সামঞ্জস্য বিধান হয়।
- আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহের বাইরেও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে একটি প্রায়োগিক বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে। নির্ধারিত প্রায়োগিক বিষয়গুচ্ছ থেকে শিক্ষার্থী তার আগ্রহ ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী যেকোন একটি বিষয় বেছে নেয়ার সুযোগ পাবে। প্রায়োগিক বিষয়ের শিখনক্রম প্রণয়নের সময়ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের, বিশেষ করে জীবন ও জীবিকার, অর্জিত শিখনযোগ্যতাসমূহ এবং ঐ বিষয়ে কর্ম উপযোগিতার জন্য নির্ধারিত দক্ষতার পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তির সর্বশেষ অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মজগতের চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনায় বিষয়সমূহের পরিসর ও শিখনযোগ্যতা নির্ধারণ করা হবে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ি একাদশ শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম প্রচলন করতে বেশ কয়েক বছর সময়ের প্রয়োজন। সেই সময়ে বিষয়সমূহের একাডেমিক বাস্তবতা, স্থানীয় ও বৈশ্বিক চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সকল বিষয়সমূহের শিখনক্রম বিন্যাস করা হবে।

২.১৩ শিখন সময় ও শিখন সময়ের বিষয়ভিত্তিক বণ্টন

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মূল কৌশল হচ্ছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক সক্রিয় শিখন – যা শুধু শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়া বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থী বিভিন্ন কৌশলে শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়ে, বাড়িতে, নিকট পরিবেশে বিভিন্ন কার্যক্রম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখন সম্পন্ন করে নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ

অর্জন করে। এরূপ নানাবিধ শিখন শেখানো কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনা করতে হলে পর্যাপ্ত শিখন সময় থাকা প্রয়োজন তবে তা শুধু শ্রেণিকক্ষভিত্তিক নয়। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাক্রমে শিখন সময়কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম পরিভাষায় শিখন সময়ের বিভিন্ন পরিভাষা ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। যেমন : কনট্যাক্ট পিরিয়ড (**Contact period**) বলতে শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সক্রিয় শিখন শেখানো সময়কে ধরা হয়েছে। ইন্সট্রাকশনাল টাইম (**Instructional time)** বলতে সেই নির্দিষ্ট সময়কে বোঝানো হয়েছে যেখানে শ্রেণিকক্ষে বা ভার্চুয়াল পরিবেশে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে সরাসরি শিখনের জন্য সহায়তা পেয়ে থাকে। আবার শিখন সময় (**Learning time**) বলতে সেই নির্দিষ্ট সময়কে বিবেচনা করা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে কোনো শিখন-সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত থাকে অথবা কার্যকর শিখনে নিবিষ্ট থাকে।[৭] যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে যোগ্যতা অর্জনের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে যেহেতু বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং এই অভিজ্ঞতা সব সময় বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে বিধায় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিখন সময়কে শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাহিরে সক্রিয় শিখনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সময়কে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী একক বা পারস্পরিকভাবে সব মিলিয়ে শিখন কার্যক্রমে যে সময়টুকু ব্যয় করবে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে শিখন সময়ের একটি পরিকল্পনা দেয়া হলো।

মোট ছুটি = ৭৬ দিন[৮] + ১০৪ দিন (শুক্রবার ও শনিবার) = ১৮০ দিন

সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন ধরে মোট কর্মদিবস = ৩৬৫ দিন - ১৮০ দিন = **১৮৫ দিন** [৯]

সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন (শুক্রবার ও শনিবার) ধরে শিখন সময় প্রাক্কলন

শ্রেণি	মোট শিখন ঘণ্টা
প্রাক-প্রাথমিক	৫০০
১ম - ৩য়	৬৩০
৪র্থ - ৫ম	৮৪০
৬ষ্ঠ - ৮ম	১০৩০
৯ম - ১০ম	১১০০
১১শ - ১২শ	১১৫০

এখানে উল্লেখ্য যে, OECD ও এর সহযোগী দেশের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত গড় শিখন ঘণ্টা ৭৯৯ এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত গড় শিখন ঘন্টা ৯১৯ ঘন্টা। উপরিউক্ত হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো সপ্তাহে দুইদিন ছুটি বিবেচনায় নিয়েও যথাযথ শিখন সময় বরাদ্দ করা সম্ভব । প্রচলিত ছুটির হিসেবকে বিবেচনায়

[7] http://www.ibe.unesco.org/es/node/12011

[8] http://www.dpe.gov.bd/sites/default/files/files/dpe.portal.gov.bd/notices/5545a07b_dc5d_460d_8b0c_fec2e21be5d4/Class%20routine%20(revised)%20(1).pdf

[9] বছরে শুক্রবার ও শনিবার মোট ১০৪ দিন এবং মোট বার্ষিক ছুটি ৭৬ দিন ধরে কর্মদিবস হিসেব করা হয়েছে।

রেখে মোট কর্মদিবস ১৮৫ দিন প্রাক্কলন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শুক্রবার ও শনিবার দুইদিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। এছাড়া শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস এবং বিজয় দিবস এই ৫টি জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য এই দিনগুলো কর্মদিবস হিসেবে ধরা হয়েছে।

ওইসিডি (OECD) ও এর সহযোগী দেশসমূহের বাৎসরিক গড় স্কুল দিবস হলো ১৮৫ দিন এবং ইউরোপের ২৩টি দেশের বাৎসরিক গড় স্কুল দিবস হলো ১৮১ দিন। প্রতিবেশি দেশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল কর্মদিবস বিভিন্ন, যেমন মেঘালয়ে ১৯২ দিন আবার মহারাষ্ট্রে ২০০ দিন। এই প্রেক্ষিতে সপ্তাহে দুইদিন ছুটি হিসেব করে প্রস্তাবিত মোট কর্মদিবস ও শিখন সময় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

শিখন সময়ের বিষয়ভিত্তিক বণ্টন

ওইসিডি (OECD) ও এর সহযোগী দেশসমূহের ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার প্রায় ৪৬টি দেশের মোট শিখন সময়ের বিষয়ভিত্তিক বণ্টনের শতকরা হার নিম্নের গ্রাফে দেখানো হয়েছে।

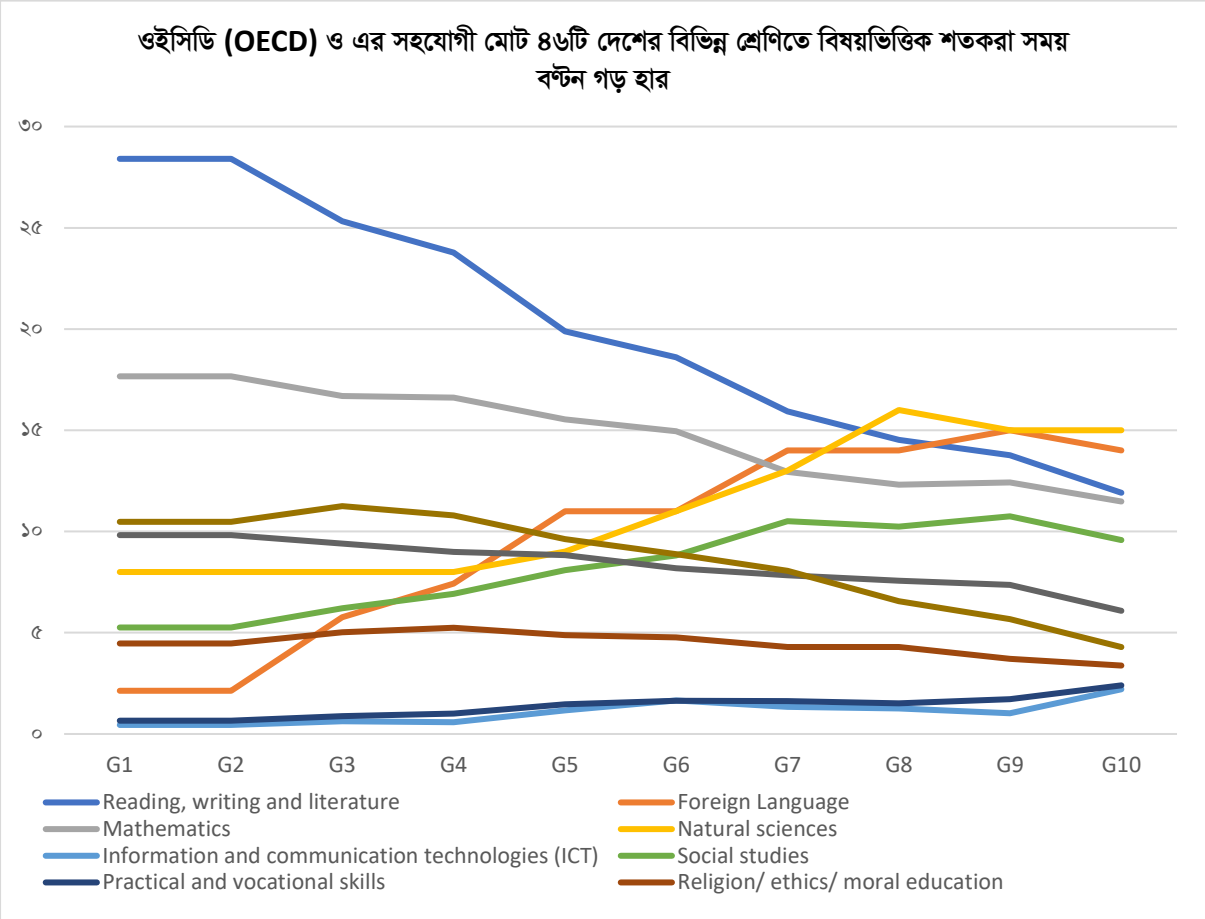

তথ্যসূত্র: Education at a Glance 2019; OECD INDICATORS.

উপরিউক্ত গ্রাফ অনুযায়ী ওইসিডি (OECD) ও এর সহযোগী দেশসমূহে গড়ে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা, গণিত ও শিল্পকলা বিষয়ে মোট শিখন সময়ের ৫২% সময় বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু, মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা, বিদেশি

ভাষা ও গণিত বিষয়ের জন্য মোট শিখন সময়ের ৪২% সময় বরাদ্দ থাকে। বিভিন্ন দেশের শ্রেণি অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক সময়বণ্টন পর্যালোচনা, বাংলাদেশের বিষয়ভিত্তিক সময়বণ্টনের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখার চাহিদার প্রেক্ষিতে বিষয়ভিত্তিক সময়বণ্টনের কাঠামো নিম্নরূপ :

বিষয়ভিত্তিক শিখন সময়ের শতকরা হার

বিষয়	শিখন সময় (%) প্রাক-প্রাথমিক		শিখন সময় (%) প্রাথমিক					শিখন সময় (%) মাধ্যমিক						
	-২	-১	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১শ	১২শ
বাংলা	২৫	২৫	২৮	২৮	২৮	২০	২০	১৮	১৬	১৫	১৪	১২		
ইংরেজি			৮	৮	৮	১২	১২	১২	১২	১৪	১৪	১৪		
গণিত	২০	২০	১৮	১৮	১৮	১৬	১৬	১৫	১৩	১২	১২	১২		
বিজ্ঞান	১০	১০	১০	১০	১০	১৪	১৪	১৪	১৪	১৫	১৪	১৫		
ডিজিটাল প্রযুক্তি	*ক্রসকাটিং হিসেবে অন্য বিষয়ের সংগে অন্তর্ভুক্ত আছে।							৫	৫	৫	৫	৫		
ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান	১০	১০	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১৩	১৩	১৩	১৫	২৫	২৫
জীবন ও জীবিকা	*ক্রসকাটিং হিসেবে অন্য বিষয়ের সংগে অন্তর্ভুক্ত আছে।							৫	৮	৮	১০	১০		
ধর্ম শিক্ষা	৮	৮	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬		
স্বাস্থ্য সুরক্ষা	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০	৮	৮	৭	৭	৬		
শিল্প ও সংস্কৃতি	১৫	১৫	১০	১০	১০	১০	১০	৫	৫	৫	৫	৫		
বিশেষায়িত													৭৫	৭৫
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

** প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ গণিত ও বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে এবং জীবন ও জীবিকা বিষয়ের প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ ইতিহাস ও সামজিক বিজ্ঞান, এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে। সুতরাং ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন সময় আলাদা করে দেখানো হয়নি।*

বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সময়ে মাতৃভাষা, গণিত, এবং শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিশুদের অধিক সময় বরাদ্দ করা হয়েছে যা প্রাক-প্রাথমিকে মোট স্কুল শিখন সময়ের প্রায় ৬০% এবং প্রাথমিক স্তরে বাংলা, গণিত, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রায় ৫৬% শিখন সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৯ম-১০ম শ্রেণিতে

মোট শিখন সময়ের প্রায় ৪৫% সময় বরাদ্দ করা হয়েছে ইংরেজি, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, এবং বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য।

মোট শিখনঘণ্টার বিষয়ভিত্তিক বণ্টন নিম্নরূপঃ

বিষয়	শিখন সময় (ঘণ্টা) প্রাক-প্রাথমিক		শিখন সময় (ঘণ্টা) প্রাথমিক					শিখন সময় (ঘণ্টা) মাধ্যমিক						
	-২	-১	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম	১১শ	১২শ
বাংলা	১২৫	১২৫	১৭৬	১৭৬	১৭৬	১৬৮	১৬৮	১৮৫	১৬৫	১৫৫	১৫৪	১৩২		
ইংরেজি			৫০	৫০	৫০	১০১	১০১	১২৪	১২৪	১৪৪	১৫৪	১৫৪		
গণিত	১০০	১০০	১১৩	১১৩	১১৩	১৩৪	১৩৪	১৫৫	১৩৪	১২৪	১৩২	১৩২		
বিজ্ঞান	৫০	৫০	৬৩	৬৩	৬৩	১১৮	১১৮	১৪৪	১৪৪	১৫৫	১৫৪	১৬৫		
ডিজিটাল প্রযুক্তি	*ক্রসকাটিং হিসেবে অন্য বিষয়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত আছে।							৫৩	৫৩	৫৩	৫৬	৫৬		
ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান	৫০	৫০	৬৩	৬৩	৬৩	১০১	১০১	১২৪	১৩৪	১৩৪	১৪৩	১৬৫	২৮৮	২৮৮
জীবন ও জীবিকা	*ক্রসকাটিং হিসেবে অন্য বিষয়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত আছে।							৫৩	৮৪	৮৪	১১২	১১২		
ধর্ম শিক্ষা	৪০	৪০	৩৮	৩৮	৩৮	৫০	৫০	৬২	৬২	৬২	৬৬	৬৬		
স্বাস্থ্য সুরক্ষা	৬০	৬০	৬৩	৬৩	৬৩	৮৪	৮৪	৮২	৮২	৭২	৭৭	৬৬		
শিল্প ও সংস্কৃতি	৭৫	৭৫	৬৩	৬৩	৬৩	৮৪	৮৪	৫২	৫২	৫২	৫৫	৫৫		
বিশেষায়িত													৮৬২	৮৬২
মোট	৫০০	৫০০	৬৩০	৬৩০	৬৩০	৮৪০	৮৪০	১০৩০	১০৩০	১০৩০	১১০০	১১০০	১১৫০	১১৫০

** প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ গণিত ও বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে এবং জীবন ও জীবিকা বিষয়ের প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহ ইতিহাস ও সামজিক বিজ্ঞান, এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে। সুতরাং ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন সময় আলাদা করে দেখানো হয়নি।*

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে আবশ্যিক বিষয়সমূহের জন্য মোট শিখন সময়ের ২৫% সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নৈর্বাচনিক ৩টি বিশেষায়িত বিষয়মূহের জন্য মোট শিখন সময়ের ৭৫% সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া একটি ঐচ্ছিক প্রায়োগিক বিষয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আলাদা করে সময় বরাদ্দ করবে।

প্রতিটি স্তরের জন্য মোট শিখনসময়কে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনসময়কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারবে। আবার যেসব বিষয় ও শিখনক্ষেত্রে স্কুল সময়ের বাহিরের পরিবেশে যোগ্যতা অর্জনের প্রাধান্য রয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও এই শিখন সময়কে ব্যবহার করা হবে।

২.১৪ শিখন শেখানো কৌশল

রেনেসাঁ-পরবর্তী আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে যে গণশিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার আদলেই শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছিল বিশ্বজুড়ে।[১০] এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মুখস্থ-নির্ভর সাক্ষরতা অর্জনের যে ধারণার উদ্ভব ঘটে সেখানে শিক্ষার্থীর নিজস্বতার তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সেই সময়ের প্রেক্ষিতেই আচরণবাদী (Behaviourism) শিখন শেখানো দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে। আচরণবাদী শিখন শেখানো মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে পাভলভ, থর্নডাইক, স্কিনারের নাম উল্লেখযোগ্য (Fosnot, 1996)। আচরণবাদী শিখন শেখানো দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থী কী শিখবে, কীভাবে শিখবে, কখন শিখবে, কোথায় শিখবে, কেন শিখবে তা আগে থেকে ঠিক করে দিতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তা, পছন্দ বা দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোন গুরুত্ব থাকেনা (Glasersfeld, 1995 eds. Steffe & Gale, 1995)। আচরণবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত শিখন নিশ্চিত করার জন্য বলবর্ধক বা শাস্তি প্রদান করতে হয় (Fosnot, 1996)। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর শিখন কখন, কীভাবে কিংবা কতবার আচরণ দিয়ে প্রকাশ পাবে এবং সেগুলো কীভাবে পরিমাপ করে শিক্ষার্থীর শিখনকে মূল্যায়ন করা হবে তাও আগে থেকে ঠিক করা থাকতে হবে। আচরণবাদপ্রসূত এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই মুখস্থনির্ভর, লিখিত পরীক্ষাভিত্তিক ও নম্বরভিত্তিক মূল্যায়ন, শিক্ষককেন্দ্রিক, একমুখী, তত্ত্বনির্ভর একটি শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার প্রচলন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের মূল দায়িত্ব হল জ্ঞান বিতরণ করা এবং শিক্ষার্থীর প্রধান দায়িত্ব হল সেই জ্ঞান কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া মুখস্থ করে পুনরুৎপাদন করা। আচরণবাদনির্ভর এই কাঠামোবদ্ধ এবং অনমনীয় শিখন শেখানো প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর সৃষ্টিশীলতার পরিপন্থী এবং ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদা ও সম্ভাবনা পরিচর্যায় অপারগ। তবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পূর্বনির্ধারিত যান্ত্রিক আচরণিক প্রতিক্রিয়া লাভের জন্য আচরণবাদী শিখন শেখানো দৃষ্টিভঙ্গি বেশ কার্যকর, তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণযোগ্যতা পরবর্তীকালে হ্রাস পায়। তাছাড়া শিক্ষার্থীর বিকাশের বিভিন্ন স্তরে তার পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণ করে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া নিরূপণ করা হত, যা পরিপক্বতাবাদ (Maturationism) হিসেবে পরিচিত (Fosnot, 1996)।

শিখনপ্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ধারণা শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য শুধু জ্ঞান অর্জন যথেষ্ট নয়। অর্জিত জ্ঞানকে পরিবেশ অনুযায়ী অভিযোজনের জন্য প্রয়োগ করার দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করাও জরুরি। কাজেই কোনো পূর্বনির্ধারিত আচরণ হুবহু অর্জন করা শিখনের উদ্দেশ্য নয়। বরং শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরিবেশের অবিরাম মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তার বৈশিষ্ট্য ও পারদর্শিতা এবং পরিবেশের উপাদান উভয়ের মধ্যেই পরিবর্তন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করে। শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার এই ধারণা গঠনবাদ/ জ্ঞানীয় বিকাশ তত্ত্ব (constructivism/ cognitivism) নামে পরিচিত, যার প্রবক্তা জ্যাঁ পিঁয়াজে।

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় গঠনবাদের ধারণা প্রাথমিক পর্যায়ে পরিপক্কতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল, যার ফলে বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শিখনের ধারা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে গবেষকগণ পর্যবেক্ষণ করেন যে, শিশুকে ভাব বিনিময় দক্ষতা এবং সৃষ্টিশীলতা, চিন্তাশীলতা, অভিজ্ঞতা, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার পরিবেশ দিতে পারলে সে শিখনের পরিপক্বতার ধারণাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। শিখনের এই উত্তরাধুনিক যুগের ধারণাই সামাজিক গঠনবাদ (Social constructivism) হিসেবে পরিচিত।

[10] Robinson K (2009) The element: how finding your passion changes everything. Penguin, New York

এর প্রধান প্রবক্তা হলেন রুশ দার্শনিক লেভ ভাইগটস্কি (Richardson, 1997; Fosnot, 1996)। এই মতবাদ অনুযায়ী শিশু জ্ঞান মুখস্থ করার বদলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করবে। শিক্ষক এক্ষেত্রে জ্ঞান বিতরণকারীর ভূমিকায় না থেকে সহায়ক বা মেনটরের ভূমিকা পালন করবেন। এই শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা প্রকল্পভিত্তিক বা সমস্যাভিত্তিক শিখনের চর্চা করবে। আর নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা না করে সহযোগিতামূলক শিখনের চর্চা করবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সক্ষমতা ও চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থী কী শিখবে, কীভাবে শিখবে, কখন শিখবে, কোথায় শিখবে এবং কেন শিখবে তা তার নিজের পছন্দ ও পারদর্শিতা বিবেচনা করে নির্ধারিত হবে। যা ব্যক্তিগত ও স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণে পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে চর্চা করা হয়। কাজেই এই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া অনেক বেশি নমনীয় এবং এর মূল্যায়নও মুখস্থনির্ভর লিখিত পরীক্ষাভিত্তিক নয়; বরং পারদর্শিতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বহুমুখী এবং বহু অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি পরিপূর্ণ বিকাশের পোর্টফোলিও তৈরির মাধ্যমে করা হয়।

পরিবেশ ও প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যে সহাবস্থান তার উপরে ভিত্তি করে মানুষের শিখন-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে আরেকটি মতবাদ প্রবর্তিত হয়েছে, যা ব্রুনফ্রেনব্রেনারের Ecological system theory নামে পরিচিত। তাছাড়া বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল টেকনোলজির প্রয়োগ মানুষের শিখনের ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে পুরোপুরি। এর ফলে মানুষ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে জ্ঞান বা তথ্য মুখস্থ করে ধারণ করেনা, বরং বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য যাচাই, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করে নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞানক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতাগুলোকে পূরণ করে সমস্যা সমাধানের নতুন কৌশল বের করার চেষ্টা করে। এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা (শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও প্রেষণা অনুযায়ী শিখনের সময়, বিষয়বস্তু, শিখনের স্থান, উদ্দেশ্য, ও শিখনের প্রক্রিয়াতে বহুমাত্রিক নমনীয়তা নিশ্চিত করা) এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করার ভিত্তিতে এক নতুন শিখন ধারণার উদ্ভব ঘটেছে, যা সংযোগবাদ (connectivism) নামে পরিচিত (Siemens, 2004)। এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় সামাজিক গঠনবাদভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়া এবং সংযোগবাদকে প্রধান শিখন ধারণা ও প্রায়োগিক কৌশল হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে, **যার মূল ভিত্তি হচ্ছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন**। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনে যেসব প্রক্রিয়া ও কৌশল চর্চার সুযোগ রাখা হয়েছে সেগুলো হলো : আনন্দময় শিখন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ও কাজভিত্তিক বা হাতে কলমে শিখন, প্রজেক্টভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক এবং চ্যালেঞ্জভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, একক, জোড়া এবং দলীয় কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ, বিষয়নির্ভর না হয়ে প্রক্রিয়া এবং প্রেক্ষাপটনির্ভর শিখন, অনলাইন শিখনের ব্যবহার ইত্যাদি।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শিক্ষকের ভূমিকাকেও স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের শিখন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজেই নিতে পারবে। শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও যোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখনকার্যক্রম আবর্তিত হবে। শিক্ষার্থীরা বাস্তব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে ভাসা ভাসা ধারণা (Surface learning) থেকে গভীর শিখনের (Deep learning) দিকে ধাবিত হবে যা তাদের শিখনকে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের বাইরেও সাধারণীকরণ করতে সাহায্য করবে। শিখনের এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনমূলক শিখনে (Reflective learning) আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষক সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবেন। প্রচলিত ভূমিকার ঊর্ধ্বে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে

শিক্ষক হয়ে উঠবেন সহ-শিক্ষার্থী। প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিফলনমূলক শিখনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেও ঋদ্ধ হবেন।

অভিজ্ঞতামুলক শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষক একজন সহায়তাকারী এবং শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সবলতা বিবেচনা করে বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে অভিজ্ঞতামুলক শিখনে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী যেমন একা শিখতে পারে, তেমনি জোড়ায় ও দলীয়ভাবেও শিখতে পারে। শ্রেণিকাজে শিক্ষক ইচ্ছে করলে যেকোন একটি বা একাধিক কৌশলের সংমিশ্রণ করতে পারেন। এই শিখন প্রক্রিয়ায় বিষয়সংশ্লিষ্ট কোন বাস্তব জীবনধর্মী সমস্যা নির্ধারণ করে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা যায়। এছাড়া শিক্ষক প্রয়োজনে ডিজিটাল টেকনোলজির প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে বাক্তিনির্ভর স্বাধীনতা (শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও প্রেষণা অনুযায়ী শিখনের সময়, বিষয়বস্তু, শিখনের স্থান, উদ্দেশ্য, ও শিখনের প্রক্রিয়াতে বহুমাত্রিক নমনীয়তা নিশ্চিত করা) এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন (ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, শিখন প্লাটফর্ম) করার ভিত্তিতেও শিখন সম্পন্ন করতে পারেন। শিক্ষক প্রয়োজনে বিষয়সংশ্লিষ্ট কোন ইস্যু নির্ধারণ করে তা নির্দিষ্ট শর্ত ও সময়সীমা উল্লেখ করে সমাধানের চ্যালেঞ্জ দিতে পারেন। শিক্ষার্থী সেই শর্ত বিবেচনায় রেখে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায় নির্ধারণ করে তা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করতে পারে। **উল্লেখ্য যে, অভিজ্ঞতামুলক শিখনের প্রতিটি ধাপেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ চর্চা করা হয়। প্রয়োজন, প্রেক্ষাপট এবং বিষয় অনুযায়ী প্রচলিত এক বা একাধিক শিখন কৌশল সমন্বিতভাবে অনুসরণ করেও বিষয়ভিত্তিক এবং আন্তবিষয়ক যোগ্যতাসমূহ অর্জন করা যায়।**

চিত্রঃ বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক সক্রিয় শিখন

শিক্ষা সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর এই শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষকের দায়িত্ব শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে যাতে শিখন অব্যাহত থাকে সেজন্য তার পরিবার, এমনকি সমাজকেও শিখন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রমে শিখন সময় নির্ধারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের শিখন সময়কেও হিসেব করা হয়েছে। সে কারণে শিখন অভিজ্ঞতা পরিকল্পনায় শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরেই নয়, বরং শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরের সংশ্লিষ্টতাও বিবেচনা করা হয়েছে।

এই শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের শিখন শেখানো কৌশল নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা, বিকাশের পর্যায় ও আগ্রহের ওপর। প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শিখন শেখানো কৌশল প্রধানত হবে খেলা ও কাজভিত্তিক (play and activity based) এবং অনুসন্ধানমূলক। দলীয় শিক্ষণ এবং সময়াবদ্ধ শিক্ষণকে উৎসাহিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে শিখনে

অংশগ্রহণ করবে এবং আনন্দের সঙ্গে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার উন্নয়ন ঘটাবে। শিখন শেখানো পদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রধানত শিখনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করা হবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিখন-শেখানো কৌশলের পরিসর হবে আর একটু বৃহত্তর ও সমন্বিত। শিক্ষার্থীদের শিখনে খেলা ও হাতে-কলমে কাজের পাশাপাশি অনুসন্ধানমূলক শিখন ও সমস্যা সমাধানমূলক শিখনকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিখন-শেখানো কৌশল হবে আরো সংগঠিত। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের শিখন পরিচালিত হবে। সকল শ্রেণিতে বিভিন্ন শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগের পাশাপাশি সুসংগঠিত অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উঁচু স্তরের চিন্তন দক্ষতা অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিখন-শেখানো কৌশল বাস্তবায়নে প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকবে। শিখন-শেখানো কৌশল হবে বিশেষত অভিজ্ঞতাভিত্তিক। শিখন-শেখানো কৌশল বিষয়বস্তুনির্ভর না হয়ে হবে প্রক্রিয়ানির্ভর। শিখন-শেখানো কৌশলে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হাতে কলমে শিখন, প্রজেক্ট এবং সমস্যাভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হবে, পাশাপাশি অনলাইন শিখনের ব্যবহারও উৎসাহিত করা হবে।

নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল শ্রেণিতে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিখন কৌশল অনুসৃত হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়েই তাদের শিখন সম্পন্ন করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা হবে। প্রচলিত পদ্ধতির বাড়ির কাজ বা হোম ওয়ার্ক না দিয়ে বিদ্যালয়েই শিখন সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। তবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের অংশ হিসেবে প্রকল্পভিত্তিক শিখন বা এসাইনমেন্ট জাতীয় কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িতে বা সামাজিক পরিসরে অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।

২.১৫ শিখন-শেখানো সামগ্রী

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মূল বাহন হলো শিখন শেখানো সামগ্রী। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য প্রণীত শিখন শেখানো সামগ্রী যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত যোগ্যতাসমূহ শিক্ষার্থীরা অর্জন করে। শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিখন শেখানো সামগ্রী বলতে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত রিসোর্সবুক, পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক বই, সম্পূরক পঠন-সামগ্রী, গল্প ও ছড়ার বই, চার্ট, কার্ড, মডেল, ডিজিটাল সামগ্রী এবং শিক্ষকের জন্য প্রণীত শিক্ষক সহায়িকাকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উপকরণ, চারপাশের পরিবেশের উপাদান ইত্যাদিও শিখন-শেখানো সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ার অভ্যেস গড়ে তুলতে প্রতি শ্রেণির জন্য বাছাই করা বয়সোপযোগী বইয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে যেগুলো ওই শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীরা সারা বছরজুড়ে পড়বে। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এই বইগুলো রাখা যেতে পারে যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বই নিয়ে পড়ে আবার ফেরত দিতে পারে।

প্রাক-প্রাথমিক: প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য মূল শিখন শেখানো সামগ্রী হলো শিক্ষক সহায়িকা। এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যেহেতু পড়তে বা লিখতে পারে না তাই প্রাক-প্রাথমিকের সকল যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে শিক্ষক সহায়িকাতে। শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতা নিয়ে শিক্ষার্থীরা মূলত এই পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাসমূহ অর্জন

করবে। শিক্ষক সহায়িকার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়ার্কবুক, গল্প ও ছড়ার বই, চার্ট, কার্ড, মডেল উন্নয়নসহ খেলনা ও বিভিন্ন উপকরণ, অডিও-ভিজুয়াল ব্যবহার করা হবে।

প্রাথমিক (১ম থেকে ৩য়) : এ স্তরের একটি মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের পড়তে, লিখতে ও অনুসন্ধান করতে শেখাকে নিশ্চিত করা। শিশুরা যেহেতু এই স্তরেও ঠিকমতো নিজে নিজে পড়ার দক্ষতা অর্জন করেনা তাই এই স্তরের মূল শিখন-শেখানো সামগ্রী হলো শিক্ষক সহায়িকা। শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন খেলা, কাজ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখন যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী ওয়ার্কবুক, পাঠ্যপুস্তক, সম্পূরক পঠন-সামগ্রী, চার্ট ও কার্ডের উন্নয়নসহ খেলনা সামগ্রী, অডিও-ভিজুয়াল ও বিভিন্ন উপকরণ প্রচলন করা হবে। পারিবারিক ও সামাজিক পরিসর ও প্রেক্ষাপটও শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রাথমিক (৪র্থ থেকে ৫ম) : এই স্তরের শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে পড়তে ও লিখতে পারে তাই শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও সম্পূরক পঠনসামগ্রী থাকবে। তবে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষায় শিখন অভিজ্ঞতাই যেহেতু শিখনের মূল উপায় সেহেতু শিক্ষক সহায়িকা এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক সহায়ক হলেও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের জন্য তাদের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ও হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে যেতে হবে পাশাপাশি বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা ও আগ্রহ বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক শিখন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করার জন্য শিক্ষকদের জন্য থাকবে শিক্ষক সহায়িকা। শিক্ষার্থীর আশেপাশের পরিবেশই হবে তার শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের মূল উপাদান। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়ক বই, সম্পূরক পঠন-সামগ্রী, চার্ট ও কার্ডের উন্নয়নসহ স্থানীয় উপকরণ, অডিও-ভিজুয়াল, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ শিখন উপকরণ/সামগ্রী/উপাদান হিসেবে প্রচলন করা হবে।

মাধ্যমিক : মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যও পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন পঠন-সামগ্রী থাকবে। এছাড়াও শিক্ষাক্রম রূপরেখার কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা ও আগ্রহ বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক শিখন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করার জন্য শিক্ষকদের জন্য থাকবে শিক্ষক সহায়িকা। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী শিখবে বিধায় তার নিজের স্থানীয় পরিবেশের উপাদানসমূহই এইক্ষেত্রে প্রধান শিখনসামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এর বাইরে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়ক বই, সম্পূরক পঠন-সামগ্রী, চার্ট, কার্ড ও অডিও-ভিজ্যুয়াল সামগ্রীর উন্নয়ন ও প্রচলন করা হবে। এক্ষেত্রে পরিবার, বিদ্যালয়, সামাজিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২.১৬ মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা

২.১৬.১ মূল্যায়নের প্রকৃতি

মূল্যায়ন শিক্ষাক্রমের একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় মূল্যায়নকে কেবল শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পুরো শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন, শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন ও সেই সঙ্গে শিখনের মূল্যায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে মুখস্থবিদ্যাভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে সরে এসে বহুমাত্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মাত্রার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা বিকাশের ধারাকে মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। সকল ধরনের শিখন মূল্যায়নের ভিত্তি হবে যোগ্যতা।

শিখন মূল্যায়ন

শিখন অগ্রগতি পরিমাপের জন্য কী ধরনের মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত কীভাবে নানা পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উপর শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের সাফল্যের মাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে। শিখনের এই উত্তরাধুনিক যুগের সামাজিক গঠনবাদী ধারণা অনুযায়ী মূল্যায়ন কৌশল গতানুগতিক নয়। এছাড়া যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে যোগ্যতার পরিমাপ করা। কাজেই জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে পৃথকভাবে মূল্যায়ন না করে এই উপাদানগুলোর মিথস্ক্রিয়ায় অর্জিত সক্ষমতার মূল্যায়ন করা জরুরি। এই মতবাদ (The theory of planned behavior-Icek Ajzen, 1991) অনুযায়ী শিক্ষাক্রম রূপরেখায় মূল্যায়নের যে কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো হল : শিখনকালীন মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে বহুমাত্রিক উপায়ে মূল্যায়ন, শিখনের জন্য মূল্যায়ন (Assessment for learning) এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন (Assessment as learning), পর্যবেক্ষণ, প্রতিফলনভিত্তিক ও প্রক্রিয়া নির্ভর মূল্যায়ন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সতীর্থ মূল্যায়ন, অংশীজন মূল্যায়ন, মূল্যায়নে টেকনোলজির (অ্যাপস) ব্যবহার, মূল্যায়নে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা এবং ইতিবাচক ফলাবর্তন প্রদান।

এই শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নের যেসকল বিষয় অনুসরণ করা হবে সেগুলো হলো :

- শিখনের জন্য শিখনকালীন মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ;
- পরীক্ষাভিত্তিক সামষ্টিক মূল্যায়ন হ্রাস;
- বিকল্প মূল্যায়ন (স্ব-মূল্যায়ন, সহপাঠী বা দল কর্তৃক মূল্যায়ন ইত্যাদি) ব্যবস্থা চালু;
- যোগ্যতার মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ;
- মূল্যায়নের মূলনীতি অনুসরণ;
- মূল্যায়নের ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন কৌশলের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা নিচে চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল-

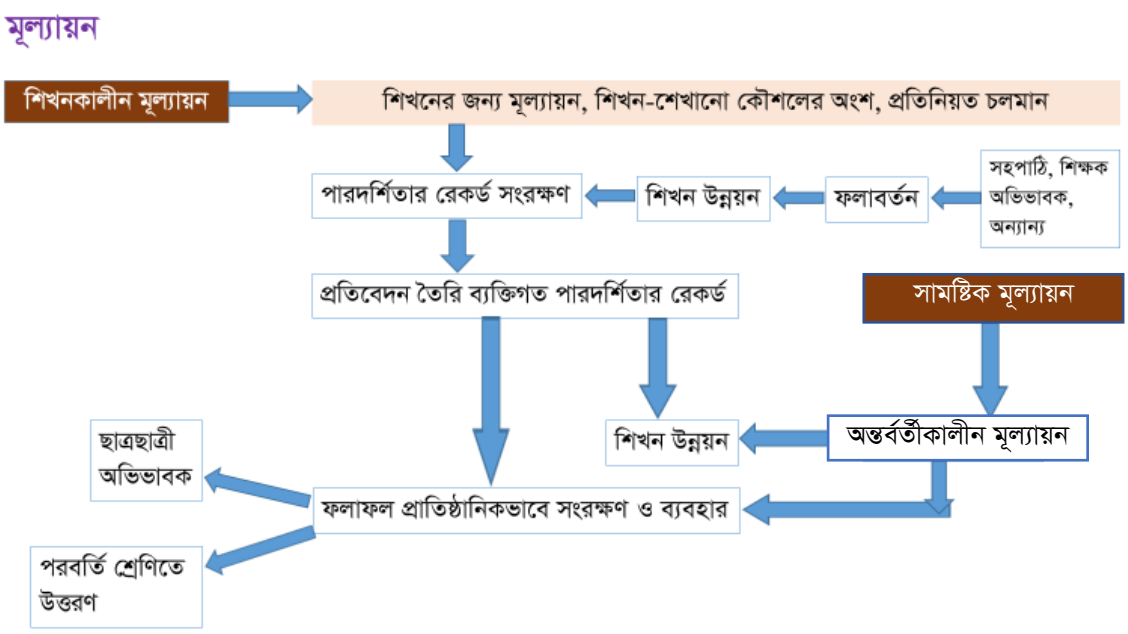

২.১৬.২ স্তরভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল

স্তরভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল এর সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রাক-প্রাথমিক	প্রাথমিক		মাধ্যমিক		
	১ম - ৩য় শ্রেণি	৪র্থ - ৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি	৯ম - ১০ম শ্রেণি	১১শ - ১২শ
শিখনকালীন মূল্যায়ন (১০০%)	শিখনকালীন মূল্যায়ন (১০০%)	বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্পকলা শিখনকালীন মূল্যায়ন ৬০% সামষ্টিক মূল্যায়ন ৪০%	বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি শিখনকালীন মূল্যায়ন ৬০% সামষ্টিক মূল্যায়ন ৪০%	বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি শিখনকালীন মূল্যায়ন ৫০% সামষ্টিক মূল্যায়ন ৫০%	**আবশ্যিক বিষয়:** শিখনকালীন মূল্যায়ন : ৩০% সামষ্টিক মূল্যায়ন: ৭০% **নৈর্বাচনিক/বিশেষায়িত বিষয়:** কাঠামো ও ধারণায়ন অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রকল্পভিত্তিক, ব্যবহারিক ও অন্যান্য উপায়ে শিখনকালীন মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে; **প্রায়োগিক বিষয়:** শিখনকালীন মূল্যায়ন- ১০০%
				দশম শ্রেণি শেষে দশম শ্রেণির যোগ্যতা যাচাইয়ে পাবলিক পরীক্ষা	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর প্রতি বর্ষ শেষে একটি করে পরীক্ষা হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

শিক্ষার্থী মূল্যায়নে শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের সংমিশ্রণ করা হয়েছে। প্রারম্ভিক শ্রেণিগুলোতে শিখনকালীন মূল্যায়নের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে উঁচু শ্রেণিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন কমিয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

পাবলিক পরীক্ষা:

শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মূল্যায়ন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে উপযুক্ত পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে পরীক্ষা পদ্ধতির ওয়াশব্যাক ইফেক্ট (Washback Effect) এর কারণে শিক্ষাক্রমের অর্জন, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শিখন সংস্কৃতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।[১১] শেখার চেয়ে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়াই মূল

[11] Asifa Abbas and Sahiba Sarwar Thaheem, "Washback Impact on Teachers' Instruction Resulting from Students' Apathy", Research on Humanities and Social Sciences, ISSN 2224-5766 (Paper) ISSN 2225-0484 (Online), Vol.8, No.6, 2018

Lynda Taylor, Washback and impact, ELT Journal Volume 59/2 April 2005QOxford University Pressdoi:10.1093/eltj/cci030

উদ্দেশ্য হয়ে যেতে পারে। শিক্ষাক্রমে যোগ্যতাকে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি সাধারণত শিক্ষার্থীর নিচুস্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের (cognitive development) মূল্যায়ন করে। তাই প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রেখে শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পাশাপাশি দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জন সম্ভবপর হবে না। তাই পাবলিক পরীক্ষায় সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি শিখনকালীন মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ী,

- দশম শ্রেণির শেষে দশম শ্রেণির যোগ্যতা যাচাইয়ে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- একাদশ শ্রেণি শেষে এবং দ্বাদশ শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

দশম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা

দশম শ্রেণির সকল বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা , ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি) সামষ্টিক মূল্যায়ন ও শিখনকালীন মূল্যায়ন উভয়ের ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হবে।

বিষয়সমূহ	শিখনকালীন মূল্যায়ন	সামষ্টিক মূল্যায়ন
বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি	৫০%	৫০%

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা

- ৩টি আবশ্যিক বিষয়ে ৩০% শিখনকালীন মূল্যায়ন ও ৭০% সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে;
- ৩টি নৈর্বাচনিক/ বিশেষায়িত বিষয়ে বিষয়-কাঠামো ও ধারণায়ন অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি এসাইনমেন্ট ও প্রজেক্টভিত্তিক মূল্যায়ন, ব্যবহারিক এবং অন্যান্য উপায়ে শিখনকালীন মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে;
- প্রায়োগিক ১ টি বিষয় বা ঐচ্ছিক বিষয়ে হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে।

২.১৬.৩ শিখন মূল্যায়নের মূলনীতি

Tsagari D., Cheng L. (2017) Washback, Impact, and Consequences Revisited. In: Shohamy E., Or I., May S. (eds) Language Testing and Assessment. Encyclopedia of Language and Education (3rd ed.). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02261-1_24

- যেকোনো ধরনের মূল্যায়নের ভিত্তি হলো যোগ্যতা। জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তবে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা না করে তাদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিবেচনা করে মূল্যায়ন পরিকল্পনা করতে হবে।
- মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নকে নিশ্চিত করতে হবে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। কী মূল্যায়ন করতে হবে তার ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। মূল্যায়ন শুধুমাত্র পেপার-পেন্সিল পরীক্ষার ওপর নির্ভর না করে পর্যবেক্ষণ, পোর্টফোলিও, প্রতিফলনভিত্তিক ও প্রক্রিয়া নির্ভর মূল্যায়ন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সতীর্থ মূল্যায়ন, অংশীজন মূল্যায়ন ও মুল্যায়নে টেকনোলজির (অ্যাপস) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অর্জনকে স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ও দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- শিখনকালীন মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করতে হবে। শিখনকালীন মূল্যায়ন শিখন-শেখানো কার্যাবলীর অংশ হিসেবে অনুশীলন করতে হবে।
- মূল্যায়নের রেকর্ড যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু রেকর্ড সংরক্ষণের চাইতে মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- মূল্যায়ন কৌশল এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে এর ফলাফল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হয়। এক্ষেত্রে সতীর্থ মূল্যায়ন, স্ব-মূল্যায়ন, পোর্টফোলিও সংরক্ষণসহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.১৬.৪ সনদ বা রিপোর্টিং

প্রচলিত নম্বরভিত্তিক সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের পরিবর্তে পারদর্শীতার বর্ণনামূলক সনদ বা রিপোর্ট কার্ডের প্রচলন করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন যোগ্যতা অর্জনের অগ্রগতির প্রতিফলন থাকবে। শ্রেণিভিত্তিক কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনের অবস্থা রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখ থাকবে। রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমেই মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। রিপোর্ট কার্ডের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবার যৌথভাবে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে। শ্রেণিশিক্ষক সরাসরি অভিভাবকের নিকট রিপোর্ট কার্ড প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অর্জন ও উন্নয়নের দিক নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করবেন। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একইরকম ধারা অনুসরণ করা হবে। পাবলিক পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ডেও শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনের অগ্রগতির প্রতিফলন শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষার্থী মূল্যায়নের রিপোর্ট কার্ড এবং পাবলিক পরীক্ষার রিপোর্টকার্ড সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন ও প্রচলন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সিস্টেমনির্ভর মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে যার মাধ্যমে মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং এর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যাবে।

অন্তবর্তীকালীন ও পাবলিক পরীক্ষায় পারদর্শিতার সনদের প্রচলনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট যোগ্যতা, দক্ষতা, অধ্যায়, শ্রেণিকাজ বা ইভেন্ট শেষেও পারদর্শিতার সনদ প্রদানের প্রচলন করা যেতে পারে।

২.১৬.৫ শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী কর্তৃক শিখন যোগ্যতা অর্জনের একটি প্রধান উপাদান হলো শিখন পরিবেশ। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি শুধুমাত্র শিখন-শেখানো সামগ্রী, শিক্ষক এবং শিখন-শেখানো কৌশলের

উপর নির্ভর করে না। কোন পরিবেশে শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিখন অগ্রগতির পাশাপাশি শিখন পরিবেশ মূল্যায়ন শিক্ষাক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের পাশাপাশি শিখন পরিবেশের মূল্যায়নকে যথাযথভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থা নিয়মিত শিখন পরিবেশ মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিখন পরিবেশ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল যথাযথ পর্যালোচনা করে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

২.১৬.৬ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি দেশ শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটুকু উন্নয়ন করেছে তা বুঝতে পারে। সেই সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা বুঝতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে নমুনাভিত্তিতে শিক্ষার্থীর যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন করা যায়। প্রচলিত ব্যবস্থায় বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ২০০২ সাল থেকে জাতীয় কৃতী অভীক্ষা (এনএসএ) ও মাধ্যমিক স্তরে ২০১৩ সাল থেকে Learning Assessment of Secondary Institutions (লাসি) প্রচলিত যার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত শিখনফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে শিখন অর্জনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জাতীয়ভাবে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) পরবর্তি সময় মূল্যায়ন ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে জাতীয় মূল্যায়ন কৌশল ও পরিকল্পনা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

২.১৭ শিক্ষাক্রমে ইনক্লুশন ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা

২.১৭.১ শিক্ষাক্রমে ইনক্লুশন

বিশ্বব্যাপী ইনক্লুশন (Inclusiveness) চর্চার ক্ষেত্রে দুই ধরনের মতবাদ পরিলক্ষিত হয়- ঘাটতি/ সীমাবদ্ধতা মতবাদ (Deficit view) এবং ন্যায্যতামূলক মতবাদ (Equitable view)। ঘাটতি/ সীমাবদ্ধতা মতবাদ, শিখনের সমস্যা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যেই সমস্যা দেখতে পায়। এ ধরনের সমস্যার উদাহরণ হলো- শিক্ষার্থী সমাজের অগ্রহণযোগ্য আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে এসেছে, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা ভিন্ন, শিক্ষার্থী হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, দেখতে কিংবা শুনতে পারে না। এই ধরণের সমস্যা মাঝারি/ তীব্র/ গুরুতর হতে পারে। ফলে শিক্ষার্থীর সাহায্য ও পরিচর্যাকারী প্রয়োজন হয়। অপরদিকে ন্যায্যতামূলক মতবাদ অনুসারে শিক্ষার্থীর পরিবর্তে শিক্ষা ব্যবস্থা ও কাঠামোর প্রতিবন্ধকতাকে শিখনের সমস্যার জন্য দায়ী করা হয়। যেমন, নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা সকল শিক্ষার্থীর সামর্থ্যকে বিবেচনা না করা, শিক্ষকের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা, বহুমাত্রিক ভাব বিনিময় কৌশলের অনুপস্থিতি ও উপকরণের অভাব। এভাবে এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও প্রবণতা অনুযায়ী সামগ্রিক কাঠামোকে নমনীয় করা হয়

(Ahsan et al., 2012) নিচের চিত্রে *(তথ্যসূত্রঃ* ACIE, 2017*)* দুটি মতবাদের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো-

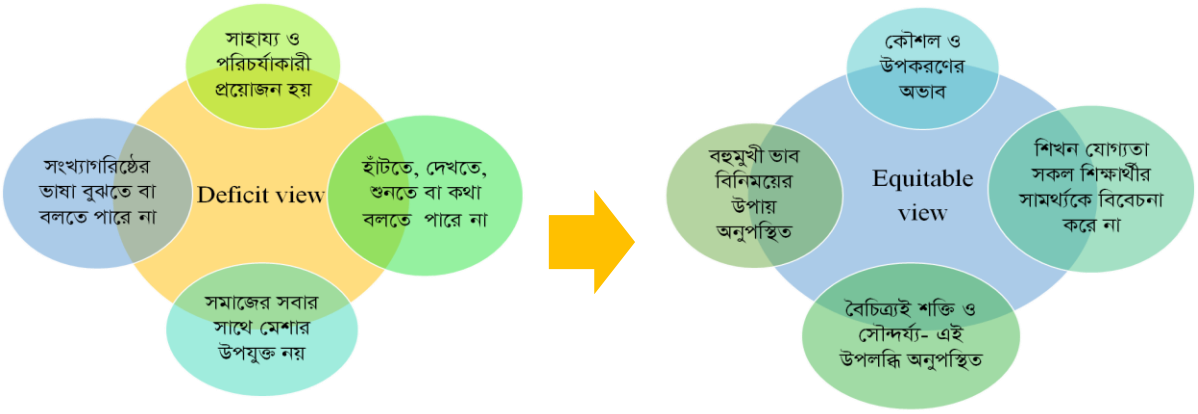

Deficit view এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সমস্যা হিসেবে ধরা হয়

Equitable view এর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগত সীমাবদ্ধতাকে সমস্যা হিসেবে ধরা হয়

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় ইনক্লুশন এর ন্যায্যতামূলক মতবাদ (Equitable view) গ্রহণ করা হয়েছে। এই মতবাদের আলোকে শিক্ষাক্রম রূপরেখার জেন্ডার ও ইনক্লুশন সংশ্লিষ্ট চিন্তার ক্ষেত্রে, ধারণায়, জেন্ডার ও ইনক্লুশন এর লক্ষ্যদল নির্ধারণে, কর্মসূচি পরিকল্পনায়, সূচক নির্ধারণে, ও সার্বিক ধারণায় একটি বড় ধরনের রূপান্তরের প্রয়োজন। নিচে (ACIE, 2017; Ainscow, 2005; DPE, 2011) বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হলো-

চিন্তার ক্ষেত্রে :	শিক্ষায় জেন্ডার ও ইনক্লুশন কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় নয় বরং মানবাধিকার ও আইনগত দায়বদ্ধতা
ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে :	শিক্ষায় জেন্ডার ও ইনক্লুশন যেসব জনগোষ্ঠী শিক্ষার বাইরে আছে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন আলাদা ব্যবস্থা নয়, বরং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাঠামো, পরিবেশ ও ব্যবস্থাগত পরিবর্তন
লক্ষ্যদল নির্ধারণ :	শিক্ষায় জেন্ডার ও ইনক্লুশন কোনো পূর্ব-নির্ধারিত গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং বৈষম্যের শিকার সকল শিশুর (শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী ও শিক্ষা বহির্ভূত) জন্য
কর্মসূচি পরিকল্পনায় :	শিক্ষায় জেন্ডার ও ইনক্লুশন কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে আলাদাভাবে সেবা প্রদান করা নয় বরং ক্ষমতায়ন ও ব্যবস্থাগত পরিবর্তন করার মাধ্যমে সকলের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক চাহিদা পূরণ
সূচক নির্ধারণ :	শিক্ষায় জেন্ডার ও ইনক্লুশন শুধু শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা নয় বরং সক্রিয় অংশগ্রহণ, যোগ্যতা অর্জন ও গ্রহনযোগ্যতা নিশ্চিত করা
সার্বিক ধারণায় :	শিক্ষায় জেন্ডার ও ইনক্লুশন কোনো বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নয় বরং শিক্ষার সার্বিক সংস্কার

শিক্ষাক্রম রূপরেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো : এটি নমনীয়, সংবেদনশীল ও যোগ্যতাভিত্তিক; ফলে ইনক্লুশন সহায়ক। একই সঙ্গে অতি মেধাবী শিশুদের শিখন-চাহিদা, সক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় এনে অগ্রগামী শিখনের (accelerated learning) চর্চাকেও বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে এই শিক্ষাক্রম যেন ধারণ

করতে পারে তা বিবেচনায় রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থী যেন তার সবলতা অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বয়সের সীমা অতিক্রম করে দ্রুত শিখন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ অন্য যেকোনো শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বহুমাত্রিকতা/সহজীকরণ/নমনীয়তার (curriculum differentiation) সুযোগও এক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিখন সময়কে শুধু বিদ্যালয়ের পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরং শিক্ষার্থীর পরিবার, এলাকা, খেলাধুলায় যে শিখন হয় তাকেও বিবেচনায় আনা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিগত চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রমে বহুমাত্রিকতা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

শিশুর বৈচিত্রকে শিক্ষা উপকরণে বা নির্দেশনায় ব্যবহার অথবা শ্রেণিতে উপস্থাপনের সময় বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। সামাজিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বাতিক্রমধর্মী শিশু বা সুবর্ণ শিশু বলা হয়ে থাকে। UNCRPD (২০০৬) অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্র হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিবন্ধিতার দ্বারা পরিচিত করাকেই মর্যাদা ও অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। UNCRPD (২০০৬) অনুযায়ী ইংরেজিতে অবশ্য প্রতিবন্ধিতার আগে ব্যক্তিকে উল্লেখ করার নির্দেশনা আছে (যেমন, Person with disability), তবে বাংলায় সেটি অনুসরণ করা যায় না। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ (MoLPA, 2013) ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন- ২০১৩ (MoLPA, 2013a) অনুযায়ী ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিবন্ধিতার দ্বারা পরিচিত করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে। তবে উল্লেখ্য যে, শিখন পরিবেশে শিশুদেরকে প্রতিবন্ধিতার মাত্রা অনুযায়ী (যেমন, মৃদু, মধ্যম, গুরুতর প্রভৃতি) সনাক্ত করার প্রয়োজন নেই। সার্বিকভাবে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদেরকে তাদের শিখন সামর্থ্য ও শিখন চাহিদা (যেমন, মৃদু সহায়তা, মধ্যম সহায়তা, অধিক সহায়তা) অনুযায়ী প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে করে শিশুর সমস্যার বদলে শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু সহায়তা প্রদান করতে সমর্থ তা পরিমাপ করা যায়। একইভাবে, শিশু যাতে তাঁর নিজের জেন্ডার পরিচিতি (ছেলে, মেয়ে, তৃতীয়/ রূপান্তরিত লিঙ্গ) নিয়ে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন অর্জন করতে পারে, সেই বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে। জেন্ডার সংবেদনশীল উপায়ে ধারণাটি শিক্ষা উপকরণে বা নির্দেশনায় ব্যবহার, শিখন পরিবেশে অথবা শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে হবে যাতে করে ইতিবাচক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে জেন্ডার সংবেদনশীল ও রূপান্তরমুখি মানুষ হিসেবে তৈরি করা যায়।

শিশুর বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার (Gardner, 1983) ধারণাকে ব্যবহার করে কোনো শিশুর সবল দিকটিকে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তার যে দিকগুলোতে অধিক পরিচর্যা প্রয়োজন তার জন্য ব্যবস্থার সুযোগ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ জেন্ডার, ধর্ম-বর্ণ, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে শিশুর সামর্থ্য, চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রকে বিবেচনা করে এই শিক্ষাক্রমটি উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই গুরুত্ব বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যদলের জন্য ইনক্লুশন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশও করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ প্রতিবন্ধী এবং স্নায়ু-বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী (নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজ্যাবিলিটি) শিশুদের জন্য প্রবেশগম্যতা, ভাব বিনিময় কৌশল, ব্রেইল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষাভিত্তিক শিখনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তৃতীয় লিঙ্গের শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, এবং দুর্যোগের সময় শিক্ষার ধারাবাহিকতাসহ বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের বিকল্প নমনীয় উপায় নির্ধারণ। তবে মনে রাখতে হবে যে

এই বিশেষ ব্যবস্থা যেন কোন সমান্তরাল ধারা সৃষ্টি না করে, বরং মূলধারায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান্তরকালীন সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ যেমন শিখন-শেখানো পদ্ধতি, মূল্যায়ন, শিখন-সামগ্রী তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শ্রেণি পর্যায়ে বাস্তবায়নসহ সকল ধাপকে জেন্ডার সংবেদনশীল ও ইনক্লুশন সহায়ক করার জন্য একটি কারিগরি নির্দেশনা তৈরি করা হবে। যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই নির্দেশনা তৈরি করার সময় শিখন-বান্ধব আর্ন্তজাতিক বা আদর্শ মানদণ্ডগুলো বিবেচনা করা হবে; যেমন: UNCRPD (২০০৬) অনুযায়ী সকল শিক্ষাব্যাবস্থাকে Universal Design for Learning (UDL) মানদণ্ড অনুযায়ী শিখন পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

২.১৭.২ শিক্ষাক্রমে জেন্ডার রূপান্তরমূলক (Transformative) এপ্রোচ

যদিও শিক্ষাক্রমে জেন্ডার কোন নতুন আলোচনা নয়, তবে এই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হলে প্রচলিত জেন্ডার এপ্রোচকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

ইতোমধ্যে অনেকবার আলোচনায় এসেছে যে, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়, বরং পাশাপাশি তার দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করাও জরুরি। আর যোগ্যতা অর্জনের এই দায়িত্ব শিক্ষার্থীর নিজেরই, শিক্ষক বা তা পরিপার্শ্ব সেখানে একটি সহায়ক পরিবেশের ভূমিকা পালন করবে মাত্র। এই শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বার বার বলা হয়েছে, কীভাবে শিক্ষার্থীর ভূমিকা এখানে পরিবর্তিত হবে, এবং সমাজের প্রচলিত রীতি ও মূল্যবোধের শুধু অনুসরণকারী না হয়ে বরং সে প্রশ্ন করবে, এবং সকল ধরনের বৈষম্য দূর করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে সক্রিয় হবে। প্রচলিত জেন্ডার সংবেদনশীল এপ্রোচ নিয়ে শিক্ষার্থীকে এই ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করা কঠিন। তাই এই শিক্ষাক্রমে জেন্ডার রূপান্তরমূলক (Transformative) এপ্রোচ বেছে নেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে জেন্ডার পরিচয় নির্বিশেষে প্রতিটি শিক্ষার্থী শুধু যে সমানভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে তা-ই নয়, বরং সে নিজেই প্রচলিত ক্ষমতার কাঠামোকে প্রশ্ন করতে শিখবে; এবং নিজের পরিবার, ও পরিপার্শ্ব থেকে বৈষম্য সৃষ্টিকারী উপাদান খুঁজে বের করে তা দূরীকরণে পদক্ষেপ নেবে।

এই এপ্রোচ বাস্তবায়নে শুরুতেই যেটা প্রয়োজন তা হল, জেন্ডার বৈচিত্র নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নিজেকে দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়া। নারী, পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গসহ সকল বৈচিত্রের মানুষ যাতে কোনরূপ বৈষম্য ছাড়াই শিখন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে, নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে, এবং নিজ সিদ্ধান্ত নেবার সক্ষমতা অর্জন করে তা-ই এই এপ্রোচ বেছে নেবার মূল উদ্দেশ্য।

যেহেতু এই শিক্ষাক্রমে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর জোর দেয়া হয়েছে, শিক্ষার্থীর শিখন এখন আর শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকছে না; বরং বাইরে নিজের পরিবারে, কমিউনিটিতে বাস্তব ও অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে শিখছে। কাজেই এই শিখন অভিজ্ঞতাগুলো এমনভাবে পরিকল্পনা করা হবে যাতে সে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে তার পরিসরের বিভিন্ন অংশিজনের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পায়, এবং একইসাথে সমাজে প্রচলিত জেন্ডার বৈষম্যসমূহকে চ্যালেঞ্জ করার উপলক্ষ্য ও সুযোগ ঘটে।

এই এপ্রোচ বাস্তবায়নের জন্য যা যা প্রয়োজন-

- শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া জরুরি। শিক্ষক যাতে তার নিজের অবচেতনে থাকা বৈষম্যের উপাদান সনাক্ত করতে পারেন এবং সচেতনভাবে তা থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট হন সেজন্য তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা পরিকল্পনার সময় খেয়াল রাখা দরকার, জেন্ডার পরিচয়ের কারণে কেউ যাতে এই অভিজ্ঞতা অর্জনে কোন বাধার মুখে যা পড়ে। এছাড়া শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর ধরন এমন হওয়া উচিৎ যাতে সেগুলো প্রকৃতিগতভাবেই সমাজের প্রচলিত জেন্ডার স্টেরিওটাইপ, জেন্ডার শ্রমবিভাজন- এই বিষয়গুলোকে চ্যালেঞ্জ করে।
- বিদ্যালয়ের শিখন পরিবেশ ও অবকাঠামোগত সুযোগ যাতে সকল জেন্ডার পরিচয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল থাকে সেটা নিশ্চিত করা জরুরি।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক ও অন্যান্য অংশিজনের মধ্যে যাতে নিয়মিতভাবে অর্থবহ যোগাযোগ ঘটে, এমন ব্যবস্থা চালু রাখা; এর ফলে বিভিন্ন অংশিজন পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে জেন্ডার রূপান্তরমূলক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

২.১৮ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ধারার সঙ্গে সমন্বয়

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকুল প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। দেশের ভিতরে যেমন দক্ষ জনশক্তির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে বিদেশেও দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকার বিবেচনায় একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শিক্ষার্থীদের জীবন ও জীবিকার জন্য প্রস্তুত করতে সকল ধরনের শিক্ষা ধারায় মৌলিক (Foundational), রূপান্তরযোগ্য (Transferable) ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট (job related) দক্ষতার অন্তর্ভুক্তি ও যথাযথ প্রতিফলন জরুরি। পাশাপাশি এক ধরনের সংগঠিত পথ-নির্দেশনাও প্রয়োজন যেন, যেকোনো ধারার শিক্ষার্থী তাদের অবস্থান, যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরস্পর পথ পরিবর্তন করে যথাযথ সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ধারার শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এ লক্ষ্যে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারায় ১ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত সকল স্তর ও শ্রেণিতে সমন্বিত ও সুবিন্যস্তভাবে মৌলিক (Foundational) ও রূপান্তরযোগ্য (Transferable) দক্ষতার যথাযথ অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিফলন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও চাহিদা বিবেচনায় যুগোপযোগী করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টিসহ শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত জনশক্তি সৃষ্টি করা এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনাও শিক্ষানীতিতে বিবৃত হয়েছে। এ লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নসহ অন্যান্য শিক্ষাধারার সঙ্গে

এর সমন্বয়ের বিষয়েও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা রয়েছে। চাকুরি বাজারের বিকাশমান ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনশক্তি তৈরি এবং ভবিষ্যৎ শ্রম-বাজারে (Job Market) টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সংশ্লেষসহ এ ধারার শিক্ষার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ও বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো বিশ্লেষণে প্রাপ্ত শিক্ষাক্রম-সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্য ও যোগাযোগ (ডিজিটাল প্রযুক্তি) প্রযুক্তি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা;
- অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী কারিগরী শিক্ষা ধারায় ভর্তি হয়ে ধাপে ধাপে নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় যাবার সুযোগ রাখা;
- সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার যে কোনো স্তরে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে অনুমোদিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো বা বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত অকুপেশনের প্রারম্ভিক লেভেলে জাতীয় দক্ষতা সনদ প্রাপ্তির সুযোগ রাখা, সেই সঙ্গে আরো প্রশিক্ষণ নিয়ে উচ্চতর লেভেলে সনদ অর্জন এবং কারিগরি ধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারার নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি সমাপ্ত করে একজন শিক্ষার্থী বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (বিএনকিউএফ) অনুযায়ী নির্ধারিত অকুপেশনের অনুমোদিত লেভেল অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- প্রত্যেক শিক্ষা ধারায় মৌলিক বিষয় বাধ্যতামূলক এবং প্রতিটি ধারার স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শ মান বজায় রেখে অন্যান্য বিষয় সংযুক্ত করা;
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কারিগরি শিক্ষা ধারার ট্রেডসমূহে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো অনুযায়ী অকুপেশন লেভেল নির্ধারণ করা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জন তথা দ্বৈত সনদায়নের সুযোগ রাখা।

উপরোক্ত নির্দেশনা বিবেচনা করার পাশাপাশি ব্যানবেইস ২০১৯ রিপোর্ট পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি সম্পন্ন করার পূর্বেই প্রায় ৩৮% এবং দ্বাদশ শ্রেণি সম্পন্ন করার আগেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রায় ২০% শিক্ষার্থী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ঝরে যায়। এই শিক্ষার্থীর অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আবার উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করার পরও অনেক শিক্ষার্থী যারা উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে না বা করেনা, তারাও একইভাবে কোনো রকম পেশাগত প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায়, নবম-দশম শ্রেণিতে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের আওতায় একটি বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) কোর্স থাকবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট বৃত্তির (অকুপেশনের) জন্য প্রস্তুত করা হবে। দশম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) দক্ষতা বিষয়ক পেশায় সরাসরি যোগ দেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করবে এবং প্রয়োজনে যোগ দিতে পারবে। বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) কোর্সটি এমনভাবে ডিজাইন করা হবে যাতে শিক্ষার্থীদের বয়োসপোযোগী বর্তমান শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আত্মকর্মসংস্থানের বা কোনো চাকুরিতে যোগদানের মতো সক্ষমতা তৈরি হয়। জাতীয়

শ্রম বাজারে সেবা, কৃষি ও শিল্প খাতের (৪০.৬১% ঃ ৩৭.৭৫% ঃ ২১.৬৫%)[১২] আনুপাতিক অবদান বিবেচনা করে বৃত্তি বা অকুপেশনগুলোর তালিকা প্রণয়ন করা হবে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক খাত ও শ্রম বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যালয়ের জন্য বৃত্তির (অকুপেশনের) ধরন নির্ধারণ করা হবে। পদ্ধতিগতভাবে নিয়মিত শ্রম বাজার জরিপ করে নতুন নতুন বৃত্তি (অকুপেশন) প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষানীতি এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে বর্ণিত কৌশল এবং জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং এ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর স্তরসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) কোর্স অন্তর্ভুক্তির একটি রূপরেখা নিম্নে দেখানো হলো। একই সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ধারার ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন ধারা থেকে পরস্পর পরিবর্তনের সুযোগ রেখে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের একটি পথ নির্দেশনা প্রদর্শিত হলো।

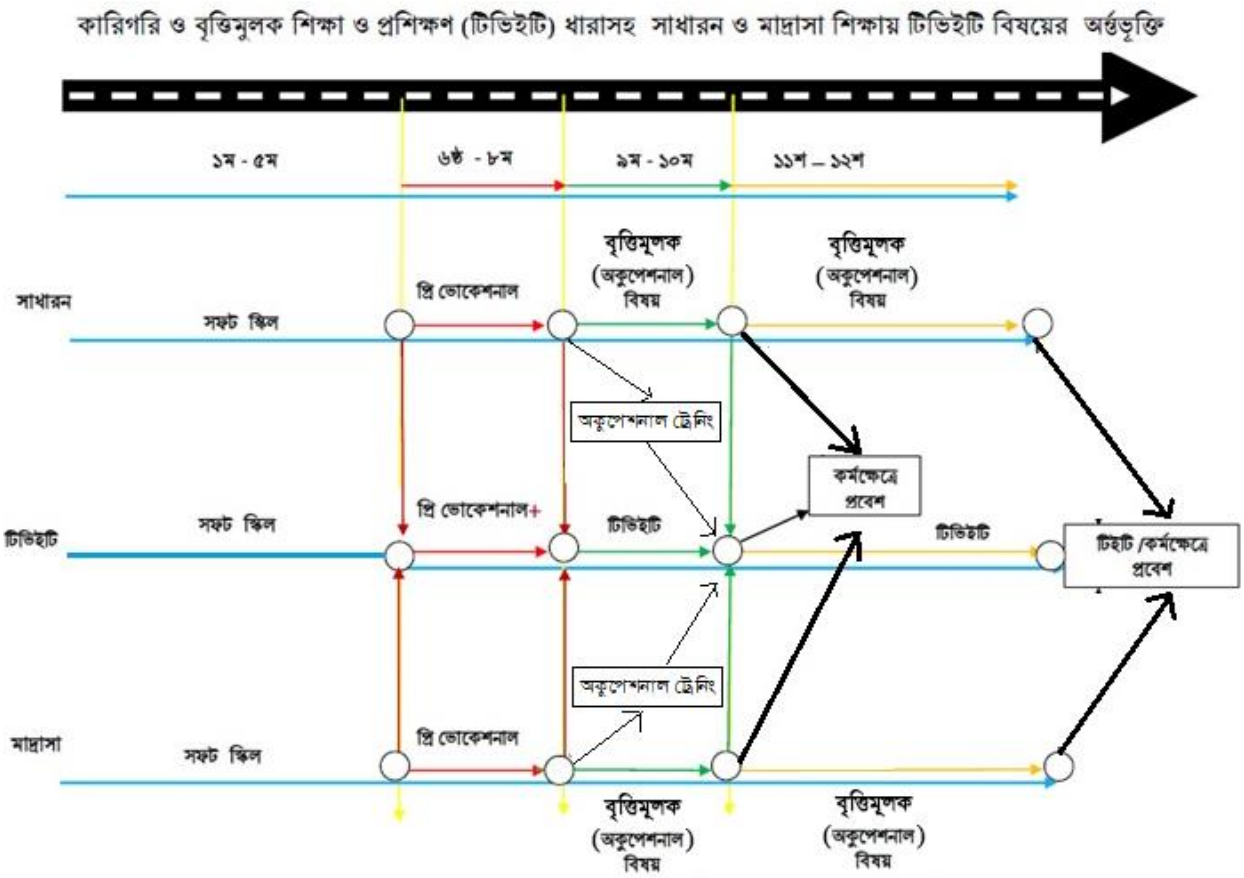

সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের সাথে একটি প্রি-ভোকেশনাল কোর্স অন্তর্ভুক্ত হলেও কারিগরি শিক্ষায় তা বর্ধিত কলেবরে হাতে কলমে অনুশীলনসহ থাকবে। সমতার রূপরেখা

[12] https://www.statista.com/statistics/438360/employment-by-economic-sector-in-bangladesh/#:~:text=The%20statistic%20shows%20the%20distribution,percent%20in%20the%20service%20sector.

(Equivalency Framework) প্রণয়নের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আসা-যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

উপরিউক্ত রূপরেখায় সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহের নির্দেশনার প্রতিফলনসহ জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও চাহিদা বিবেচনায় সুপারিশসমূহ নিম্নোক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১. সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার ৮ম ও ১০ম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের টিভিইটি ধারায় ভর্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
২. সাধারণ ও মাদ্রাসা ধারায় প্রি-ভোকেশনাল ও বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) কোর্সসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে এই ধারা দু'টিকেও টিভিইটি ইনক্লুসিভ শিক্ষা ধারা হিসেবে গন্য করা যায়।
৩. কারিগরি শিক্ষা ধারার স্বাতন্ত্র্য ও নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী দক্ষতার জাতীয় ও বৈশ্বিক মানদণ্ড অক্ষুণ্ন রেখে শিক্ষাক্রম রূপরেখায় সকলের জন্য অর্জন উপযোগী ১০টি যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত মৌলিক বিষয়সমূহ সমন্বয়ের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা হয়েছে। যা আন্তঃধারা ব্যবধান কমাতে সহায়তা করবে এবং যথাযথ সমতার রূপরেখার (Equivalency Framework) মাধ্যমে পারস্পরিক ধারা পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
৪. এসএসসি বা এসএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমানের কোর্স সম্পন্ন করার পর ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ থাকবে।
৫. কারিগরি শিক্ষা ধারার কোর্সের কাঠামো ও ধারণায়ন (conceptualization) অনুযায়ী ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রকল্পভিত্তিক, তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও অন্যান্য উপায়ে মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে। কারিগরি শিক্ষা ধারায় নবম শ্রেণি শেষে শুধুমাত্র কারিগরি বিষয়ে পাবলিক পরীক্ষা হবে এবং দশম শ্রেণি শেষে সকল বিষয়ের পাবলিক পরীক্ষা হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি শেষে সকল বিষয়ে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৬. শিক্ষাক্রম রূপরেখার ১০টি বিষয় ও কারিগরি ধারার কারিগরি বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়সমূহের জন্য যৌক্তিকভাবে সময় বরাদ্দ করা হবে।
৭. টিভিইটি শিক্ষা ধারায় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রি-ভোক বিষয়ের সাথে কর্মমূখী কারিগরি শিক্ষার প্রাথমিক ধারণা বিষয়ক একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২.১৯ মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয়

মাদ্রাসা শিক্ষা এই উপমহাদেশের প্রাচীনতম একটি ধারা। আমাদের দেশে এটি তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি স্বতন্ত্রধারা হিসেবে প্রচলিত। মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার মূলভিত্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই মাদ্রাসা শিক্ষাধারা সাজানো হয়েছে। সেই লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোই এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাধারণ শিক্ষাধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলোও মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

২.১৯.১ মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের ভিত্তি

দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবী এবং বিশ্বায়নের যুগে সুযোগ এবং সম্ভাবনার যেমন সাধারণীকরণ হয়েছে, তেমনি সকলের সামনের চ্যালেঞ্জ ও বাধাগুলোর ধরনও এক। ন্যূনতম অবশ্য অর্জনীয় দক্ষতাসমূহ না থাকলে সেসব

চ্যালেঞ্জ ও বাধা মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া পরিবর্তনের বহুমাত্রিকতার কারণেও প্রতিনিয়ত খাপ খাইয়ে চলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সকল ধারার শিক্ষার্থীদেরই ন্যূনতম সাধারণ (Common) কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। ফলে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা সাপেক্ষে বৈষম্য কমিয়ে এনে কতকগুলো অর্জনযোগ্য মূল যোগ্যতা সকলের জন্য নির্বাচন করা প্রয়োজন। এটি বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থাকে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে একটি কাঠামোতে আনতে সহায়তা দিয়ে থাকে।

যে কোনো উদ্যোগ তার পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপটকে স্মরণ করে অগ্রবর্তী হয়। মাদ্রাসা ধারার শিক্ষাব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়। এর একটি সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। মাদ্রাসা মুসলিম উম্মার বুনিয়াদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুগ যুগ ধরে পরিগণিত হয়ে আসছে। এর কারণ হলো, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সফলতার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সর্বদা সচেষ্ট ছিল।

বস্তুতঃ ইসলাম ধর্মের উন্মেষ কালেই মাদ্রাসা শিক্ষার সূচনা ঘটে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (صلى الله عليه وسلم) হিজরতের পূর্বে মক্কার অদূরে অবস্থিত সাফা পাহাড়ের পাদদেশে 'দারুল আরকাম' এবং হিজরতের পর মসজিদে নববীর উত্তর-পূর্ব দিকে 'সুফফা আবাসিক মাদ্রাসা' ও 'দারুল কুররা মাদ্রাসা' স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা.) সিরিয়ায় ও হযরত আলী (রা.) বসরা ও কুফায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। খোলাফায়ে রাশেদার সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪০টিরও অধিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্মের প্রসারের ধারাবাহিকতায় ৭১২ সালে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

১২০৪ সালে মুসলমানদের বঙ্গ বিজয় ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বাংলায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। সুলতানী শাসনামলে (১২১০-১৫৭৬ খ্রিঃ) বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি, নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতিক, কালাম, তাসাউফ, হিকমত ও দর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমার্জিত ও আধুনিকীকরণ হয়। বিশেষভাবে মুঘল আমলে মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে ইসলামি বিভিন্ন বিষয়াদির সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়। এগুলোর মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ভূগোল, হিসাববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, লোক প্রশাসন, জীববিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন ও প্রাণিবিদ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারত উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমানদের সম্মিলিত দাবীর প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে দীর্ঘকাল সরকারি কাজে, বিশেষ করে দলিল-দস্তাবেজ ও আদালতের ভাষা ফার্সি থাকায় মাদ্রাসা শিক্ষা প্রায়োগিক গুরুত্ব লাভ করে। সে সময় মোল্লা মাজদুদ্দীন (মোল্লা মা'দান) রহ. এর নেতৃত্বে 'কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে তা ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তী কালে বাংলার বিভিন্ন স্থানে 'কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা'র অনুসরণে নতুন নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, কলকাতা মাদ্রাসা ধারার বাইরেও বাংলায় বিভিন্ন ধারার মাদ্রাসা চালু ছিল। ব্রিটিশ সরকারের ১৯০৬ সালে গঠিত 'মাদ্রাসা রিফোর্ম কমিটি' কর্তৃক ১৯১৪ সালে 'রিফোর্মড মাদ্রাসা স্কীম' নামে মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমকে আধুনিকায়ন করার চেষ্টা করে এবং তা ফলপ্রসূ হয়। এখানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো মক্তব এবং মাদ্রাসাগুলোকে আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মতো উন্নত মাত্রায় নিয়ে যাওয়া। এপ্রিল ১৯১৫ তে এটি কার্যকর হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমের এই পরিমার্জন অধিকাংশরাই মেনে নিয়েছিলেন - যা 'নিউ স্কীম' নামে পরিচিত। অল্প কিছু সংখ্যক মাদ্রাসা তাদের পুরনো ধারাতেই আবদ্ধ ছিল। এ সকল মাদ্রাসার মধ্যে অন্যতম কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা যা ওল্ড স্কীমের আওতাভুক্ত ছিল।

১৯৭৩ সালের ৩০শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার মাঠে ভাষণে প্রদত্ত নির্দেশনার মাধমে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে নতুনভাবে গতি সঞ্চার হয়।

১৯৮৪ সালে 'মুস্তফা বিন কাসিম কমিটি'র সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা স্তরের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। এভাবে বর্তমানে বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে উঠেছে। ফলে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার সমমান পাচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য কিছু সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম শিক্ষার সুযোগ তৈরির পাশাপাশি জীবনধারণ-সংক্রান্ত শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে শিক্ষার্থীরা যেন উৎকর্ষে ভূমিকা রাখতে পারে সে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের পূর্ববর্তী সকল গবেষণা থেকে শিক্ষার্থীর উৎকর্ষ সাধনকল্পে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা পাওয়া গিয়েছে যা সাধারণ শিক্ষাধারার সাথে মাদ্রাসার শিক্ষাধারার সমন্বয়কে অনুপ্রাণিত করে।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১১ সালে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। ২০১৫ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২.১৯.২ বিশেষায়িত ধর্মীয় শিক্ষাধারা হিসেবে রূপরেখায় উল্লিখিত রূপকল্প অর্জনের পাশাপাশি ইসলামি মূল্যবোধে সমৃদ্ধ তাকওয়াবান যোগ্য আলিম তৈরি করাও মাদ্রাসা শিক্ষাধারার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২.১৯.৩ মাদ্রাসা শিক্ষাধারার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত অভিলক্ষ্যসমূহের সাথে মাদ্রাসাকে ইসলামি আকিদা, আমল, আখলাক ও ইলম চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

২.১৯.৪ মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীকে বিশ্বপরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য, তাকওয়াবান ও আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে এবতেদায়ী থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ জরুরি। এবতেদায়ী ও দাখিল-আলিম পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করে একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করবে বা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে।

২.১৯.৫ শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত সংহতি, দেশপ্রেম, সম্প্রীতি, পরমতসহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা/সম্মান ও শুদ্ধাচার - এই মূল্যবোধগুলোর পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাধারার ক্ষেত্রে ইসলামি মূল্যবোধকে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই শিক্ষাধারা ইমান, আকিদা, আমল এবং আখলাক এর মধ্য দিয়ে ইসলামি মূল্যবোধকে ধারণ করে।

২.১৯.৬ শিক্ষাক্রম রূপরেখায় উল্লিখিত শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় যুক্ত হবে তাকওয়া। তাকওয়া বলতে আল্লাহর ভয় ও পরকালীন জবাবদিহিতাকে সামনে রেখে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবন যাপনকে বুঝানো হয়। ফলে একজন শিক্ষার্থী নিজ সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি সম্প্রীতি সংস্থাপন করতে উদ্যোগী হয়ে উঠবে।

২.১৯.৭ শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিক্ষার্থীর যেসব দক্ষতা নির্ধারণ করা হয়েছে তা মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় সমভাবে প্রযোজ্য।

২.১৯.৮ মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এবতেদায়ি থেকে আলিম স্তর পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত দশটি মূল যোগ্যতা অর্জন করবে। স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এই শিক্ষাধারা

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত 'ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলী অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে '- যোগ্যতাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইসলাম শিক্ষা শিখনক্ষেত্র হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা শিখনক্ষেত্র অনুযায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্বতা ও সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। যেমন: স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির অস্তিত্ব কল্পনাতীত হওয়ার উপলব্ধি। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের জ্ঞান প্রয়োগ করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনের নিয়মিত চর্চা ও কুরআন মজীদ তেলাওয়াতে দক্ষ হতে হবে। সর্বোপরি, আলাহ তা'য়ালার প্রতি সঠিক ও সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখে জীবনের প্রতিটি কাজে তাঁর আদেশ নিষেধকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আত্মনিবেদন দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

২.১৯.৯ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের বিবেচনায় মাদ্রাসা শিক্ষাধারার জন্য এবতেদায়ী থেকে দাখিল স্তর পর্যন্ত বিষয়সমূহের সমন্বয়ভিত্তিক যৌক্তিক বিন্যাস গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

শিখন-ক্ষেত্র	**স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়সমূহ**		
	এবতেদায়ী	দাখিল	
	১ম- ৫ম	৬ষ্ঠ- ৮ম	৯ম- ১০ম
ইসলাম শিক্ষা	১. কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ; ২. হাদীস শরিফ; ৩. আরবি; ৪. আকাইদ ও ফিকহ এবং ৫. ইসলামের ইতিহাস		
ভাষা ও যোগাযোগ	১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. গণিত ৪. বিজ্ঞান ৫. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ৬. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৭. শিল্পকলা	১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. গণিত ৪. বিজ্ঞান ৫. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ৬. জীবন ও জীবিকা ৭. ডিজিটাল প্রযুক্তি ৮. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৯. শিল্প ও সংস্কৃতি	১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. গণিত ৪. বিজ্ঞান ৫. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ৬. জীবন ও জীবিকা ৭. ডিজিটাল প্রযুক্তি ৮. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৯. শিল্প ও সংস্কৃতি
গণিত ও যুক্তি			
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি			
ডিজিটাল প্রযুক্তি			
সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব			
জীবন ও জীবিকা			
পরিবেশ ও জলবায়ু			
ধর্ম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা			
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা			
শিল্প ও সংস্কৃতি			
বিশেষ দ্রষ্টব্য : এবতেদায়ী পর্যায়ে *ডিজিটাল প্রযুক্তি* এবং *জীবন ও জীবিকা* আলাদা বিষয় হিসেবে না থাকলেও উক্ত দুইটি বিষয়ের অন্তর্গত শিখনযোগ্যতা অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্য দিয়ে সমন্বিতভাবে অর্জিত হবে।			

২.১৯.১০ বিস্তারিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষায়িত বিষয়সমূহ চূড়ান্ত করা হবে এবং তার শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন, শিখন-শেখানো কৌশল ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার

বিশেষায়িত বিষয়সমূহে এবতেদায়ী থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ৫টি আবশ্যিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে-

১. কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ; ২. হাদীস শরিফ; ৩. আরবি; ৪. আকাইদ ও ফিকহ এবং ৫. ইসলামের ইতিহাস

২.১৯.১১ মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম পরিমার্জন

মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ স্বরূপ সংক্রান্ত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবং এনসিটিবির গবেষণার ফলাফলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে। গবেষণায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার সুপারিশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অন্যান্য শিক্ষা ধারার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার বৈষম্য কমিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় যুগের চাহিদা ও ভবিষ্যৎ কর্মজগতের জন্য প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেন স্বাস্থ্য সচেতনতা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ডিজিটাল প্রযুক্তিসহ সামাজিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ গবেষণায় উঠে এসেছে। শ্রেণি-কার্যক্রমকে আনন্দদায়ক, বহুমুখী ও কার্যক্রমনির্ভর করে দক্ষতা ও যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন চালুর সুপারিশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর যথাযথ শিখন অর্জনে গঠনকালীন মূল্যায়ন প্রয়োজন বলেও অংশীজনরা মতামত দিয়েছেন। যৌক্তিকতা, নীতি-নির্দেশনা, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সর্বোপরি অংশীজনদের মতামত বিশ্লেষণে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বিত ও সর্বজন প্রত্যাশাসমূহ নিম্নরূপ :

- সকল শিক্ষার্থীর জন্য বর্ণিত ১০টি মূল যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সাধারণ বা অন্যান্য শিক্ষাধারার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার বিদ্যমান বৈষম্য (বিষয়, বিষয়বস্তু, নম্বর, সময়, ভর ইত্যাদি) কমিয়ে এনে যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমযোগ্যতা ও সমগ্রহণযোগ্যতা যেন নিশ্চিত হয় সে লক্ষ্যে পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;
- পরিবর্তনশীল কর্মবাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সার্বিকভাবে সুস্থ ও ভালো থাকার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শিল্প, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ইত্যাদি ধর্মীয় নীতি নির্দেশনা ও ভাব গাম্ভীর্য বজায় রেখে সংযুক্ত ও চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাধারণ শিক্ষায় প্রস্তাবিত ১ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও বিষয় চালুর প্রায়োগিক ধারণাটি বিবেচনা করা;
- ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সমন্বয়ের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম আনন্দদায়ক, অংশগ্রহণমূলক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং বহুমুখী করা;
- যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পাশাপাশি শিখনকালীন ধারাবাহিক মূল্যায়নকে গুরুত্ব প্রদান করে দক্ষতা ও যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করা;
- ধর্মীয় শিক্ষার গভীরতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ;

- শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত মূল্যবোধ, গুণাবলি, দক্ষতা, যোগ্যতা ও মূলনীতি অনুসরণ করে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা।

উপর্যুক্ত প্রত্যাশা, মতামত এবং সর্বজনগ্রাহ্য পরামর্শের সফল প্রতিফলনে মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হবে :

- ১০টি মূল যোগ্যতা অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়নির্ভরতা কমিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন;
- যে বিষয়বস্তুসমূহ নিশ্চিতভাবেই থাকতে হবে তা নির্ধারণ করে নিজস্বতা/স্বকীয়তা বজায় রেখে পরিমার্জন করা;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুখস্থনির্ভরতা কমিয়ে যোগ্যতাভিত্তিক অভিগমনে (Approach) কার্য ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করে বিষয় এবং বিষয়বস্তুর ভার কমানো;
- ধারার স্বকীয়তা বজায় রেখে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় আন্তঃবিষয় এবং আন্তঃশাখাভিত্তিক কৌশল প্রয়োগ করে বিষয় এবং বিষয়বস্তুর ভার, সময়, নম্বর ইত্যাদির বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- নীতি-নির্দেশনা ও গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা এবং রূপরেখার মৌলিক নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে কারিগরি অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন-ক্ষেত্র ও বিষয়-সংক্রান্ত পদ্ধতিগত বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- অবশ্য গ্রহণীয় বিষয়সমূহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিহ্নিত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যমান বৈষম্য কমানো;
- শিক্ষার্থী যেন অন্য যে কোনো ধারায় শিক্ষার সমান সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা রাখা;
- বিষয়, বিষয়বস্তুর প্রাধান্য কমিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা;

শিক্ষা-কার্যক্রম শেষে একজন শিক্ষার্থীর কাছে যে প্রত্যাশা থাকে তা যথাযথভাবে অর্জন হচ্ছে কিনা সে বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জন কার্যক্রম পরিচালনা করলে বিষয়বস্তুর ভার অনেকাংশে কমানো সম্ভব। শিক্ষার্থীকে অনেক বেশি বিষয়বস্তু না দিয়ে কীভাবে অন্বেষণ বা অনুসন্ধান করে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে যোগ্যতা অর্জন করতে হয় তা শেখানো গেলেই জীবনব্যাপী শিখনের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়া সম্ভব।

২.২০ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ (Curriculum Dissemination) ও প্রশিক্ষণ

এই শিক্ষাক্রম দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে সকল অংশীজনকে পরিপূর্ণ ও সঠিক ধারণা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। সকল পর্যায়ে একই ধারণা প্রদান করা না গেলে শিক্ষাক্রমের সঠিক ও সফল বাস্তবায়ন অসম্ভব। কাজেই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় শিক্ষাক্রম কাঠামো, শিক্ষাক্রমের ধারণার ব্যাপক বিস্তরণের জন্য একটি যোগাযোগ ও বিস্তরণ কর্ম-কৌশল গ্রহণ করা হবে। এই কর্ম পরিকল্পনার আওতায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক, বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক, নীতি নির্ধারক পর্যায়ের ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও ভূমিকা পর্যালোচনা করে আলোচনা, সেমিনার, যোগাযোগ উপকরণ তৈরি, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা প্রভৃতি আয়োজন করা হবে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ একদিকে যেমন সরাসরি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে বিস্তরণ ঘটানো হবে, সেই সঙ্গে আইসিটি ব্যবহার করে বিভিন্ন মিডিয়াতে অনলাইন ও অফলাইন বিস্তরণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করবেন শিক্ষক সমাজ। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের পূর্বেই সকল শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্টাফের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণে অফলাইন ও অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রস্তুত করা হবে।

এনসিটিবি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তরণের জন্য মাস্টার ট্রেইনার পুল তৈরি করবে। পরবর্তী কালে ২০২৩ সাল থেকে দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পূর্বেই স্ব স্ব অধিদপ্তর এ সকল স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

এছাড়াও এনসিটিবি লার্নিং প্লাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ও ইস্যুভিত্তিক অনলাইন কোর্স চালু করবেন।

২.২১ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও প্রচলনের পর অংশীজনদের প্রত্যাশা শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন। নতুন শিক্ষাক্রম ২০২২ সালে পাইলটিং করার পর ২০২৩ সাল থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে। শিক্ষাক্রম রূপরেখার পরিমার্জন ও পরিবর্তনসমূহ বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে তার যথাযথ গ্রহণ, অনুধাবন, অনুশীলন, প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। অন্যথায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিমার্জন বা সংস্কার ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল পর্যায়ে উন্নয়ন বা সংস্কার অত্যাবশ্যক সেগুলো হলো:

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষাক্রম, বিষয় ও শিখন-শেখানো পদ্ধতির চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত দক্ষ, পেশাদার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক - শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের মূল চালিকা শক্তি হলেন শিক্ষক। শ্রেণিকক্ষ বা এর বাইরে পরিকল্পিতভাবে যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে তার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্রমের যোগ্যতাসমূহ অর্জন করবে। সুতরাং শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নতুন বিষয় ও শিখন-শেখানো পদ্ধতির চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ, পেশাদার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিখন ক্ষেত্র, যোগ্যতা ও তার বাস্তবায়ন কৌশলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা, দায়িত্ব, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তার প্রতিফলন প্রয়োজন। বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী পেশাদার শিক্ষক নিয়োগ করে এ পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

শিক্ষক: যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি

নতুন শিক্ষাক্রমের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও পরিমার্জনসহ শিক্ষায় প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ, পেশাদার এবং দায়িত্বশীল শিক্ষক প্রয়োজন। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক হচ্ছেন মূল চালিকা শক্তি। সুতরাং বিদ্যমান শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নসহ ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলতে একটি শিক্ষক নিয়োগ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষক যেন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দায়িত্বশীল, সৎ ও নির্মোহভাবে আত্মতৃপ্তি সহকারে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন তা নিশ্চত করতে হবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেহেতু যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের বিকল্প নেই তাই শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুমোদনের অব্যবহিত পরেই যত দ্রুত সম্ভব এ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষক নিয়োগ ও উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রণয়নে মূলত দুইটি দিক বিবেচনায় নিতে হবে;

১. বিদ্যমান শিক্ষকদের নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা

২. নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষক মানদণ্ড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী নিয়োগ, পদায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ

শিক্ষক নিয়োগ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটির উত্তর নিশ্চিত করা জরুরি, তা হলো-

কেন একজন শিক্ষক তার অভ্যস্ত পুরানো শিখন-শেখানো পদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন শিক্ষাক্রমের ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন?

কিংবা

কেন একজন মেধাবী তরুণ শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেবেন?

২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক তৈরির জন্য যে পরিকল্পনা (শিক্ষাক্রম) তা বাস্তবায়নের জন্য প্রধান কারিগর হচ্ছেন শিক্ষক সুতরাং শিক্ষক উন্নয়নে সর্বোচ্চ বিনিয়োগের বিকল্প নেই। তবে সমন্বিত এ পরিকল্পনায় যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে, তা হচ্ছে:

- বিদ্যমান শিক্ষকদের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- শিক্ষকদের জন্য একাডেমিক (গবেষণা, বৃত্তি ইত্যাদি), আর্থিক (বেতন কাঠামো, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি), প্রশাসনিক (পদোন্নতি, পদসোপান ইত্যাদি) এবং সামাজিক প্রণোদনা (পুরস্কার, পদক ইত্যাদি)
- শিক্ষক প্রণোদনার সঙ্গে সমন্বিতভাবে জবাবদিহির ব্যবস্থা
- শিক্ষাবিজ্ঞান, বিষয় ও আন্ত:বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ
- শিক্ষা প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- প্রশিক্ষণ, গবেষণাসহ সকল ক্ষেত্রে আধুনিক অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি

একইসঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেকোনো জরুরি অবস্থায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা থাকাও একজন শিক্ষকের জন্য অতীব জরুরি। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষক উন্নয়ন মানদণ্ড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী শিক্ষক-প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে শিক্ষাক্রম রূপরেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। বিদ্যমান শিক্ষক এবং ভবিষ্যতে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন তাদের নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করার এ কার্যক্রম যত দ্রুত সম্ভব শুরু করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ সামাজিক পরীক্ষাগার (সোশ্যাল ল্যাব), বিজ্ঞান ল্যাব, আইসিটি ল্যাব, আইটি অবকাঠামো স্থাপন ও প্রয়োজনীয় নন টিচিং স্টাফ -

একুশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রণীত রূপরেখার সফল বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের পরিমার্জিত নকশা প্রণয়নে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামোর সংগে খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল ইত্যাদি সংযুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষাক্রমের গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতাসমূহ অর্জন নিশ্চিত করার স্বার্থে বিদ্যালয়ে সামাজিক পরীক্ষাগার (সোশ্যাল ল্যাব), বিজ্ঞান ল্যাব, আইসিটি ল্যাব ও আইটি অবকাঠামো স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। একই সংগে বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় নন টিচিং স্টাফ নিয়োগের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরী।

উপযুক্ত শিখন পরিবেশ - শিক্ষাক্রমের উল্লিখিত শিখন যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে যথাযথ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিখনের সর্বজনীন ডিজাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদির পাশাপাশি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর যথাযথ সংখ্যা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও নিয়মিত স্টেশনারি সরবরাহ, অভিভাবকসহ

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

কার্যকর শিখন-শেখানো সামগ্রী: শিখন যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষকের পাশাপাশি শিখন-শেখানো সামগ্রী বড় ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের বয়স, বিকাশের পর্যায়, আগ্রহ বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখন-যোগ্যতা অর্জনের জন্য কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও সামগ্রী উন্নয়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখার যোগ্যতাসমূহ অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্ভরতা কমিয়ে শিক্ষক সহায়িকা ও অন্যান্য সম্পূরক পঠন সামগ্রীর ওপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনের জন্য প্রাসঙ্গিক শিখন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যা শিক্ষক সহায়িকাতে উল্লেখ থাকবে। তাছাড়া বিদ্যালয়, সমাজ ও চারপাশের পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক সহায়তা এবং সঠিক সময়ে সামগ্রিক পরিবেশ ও কার্যকর মাল্টি সেন্সরি শিখন-শেখানো সামগ্রীর সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বিদ্যালয়ের সাথে তার আশেপাশের সেবাখাত, শিল্প খাত, ব্যবসা, স্থানীয় সরকার ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিখন সম্পর্ক - শিক্ষার্থীরা পরিকল্পিতভাবে পরিবার, সমাজ, আশেপাশের সেবা, ব্যবসা ও সামাজিক অন্যান্য খাতসহ জনপ্রশাসন খাতের সংগে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত হবে এবং সেখানে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করবে, অনুসন্ধান করবে, ধারণা পরখ করবে এবং এর মাধ্যমে তারা জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে। ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বর্ণিত খাতসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রম রূপরেখার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বাইরের সময়কেও কার্যকর শিখন সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা পদ্ধতিগতভাবে কার্যকর শিখনের জন্য নিবিষ্ট হবে। এজন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে এ নিবিড় যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ যেমন শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে সহযোগিতা করবে সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ও তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পরিবার ও সমাজকে সংযুক্ত করবে।

কারিগরি স্কুল ও কলেজের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ - শিক্ষাক্রম রূপরেখায় সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে যে সমন্বয় সাধনের কৌশল বর্ণিত হয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়নে কারিগরি স্কুল ও কলেজের সাথে বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন জরুরি। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষায় জীবন ও জীবিকা বিষয়ের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা থেকে কারিগরী শিক্ষায় স্থানান্তরের প্রয়োজনে কিংবা দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ তৈরির জন্যও এ প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন করা জরুরি।

বিদ্যালয়কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা (School as Social & cultural hub)- শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিক্ষার ধারণায়ন এবং কৌশলে যে পরিবর্তন ও পরিমার্জন প্রস্তাব করা হয়েছে তার সফল বাস্তবায়নে বিদ্যালয়কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজ ও তার উপাদানসমূহের প্রত্যক্ষ সংযোগ শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন ত্বরান্বিত করবে, যা একুশ শতকের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম অনুষঙ্গ।

খ) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিমার্জন, পরিবর্তন বা সংস্কার জরুরি। নিচে তেমনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হলো।

শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ি প্রণীতব্য শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে-

- শিক্ষাক্রমের ধারণায়ন, কৌশল, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের সমন্বয় করা প্রয়োজন।
- সমন্বিত ও ধারাবাহিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা জরুরি। তাছাড়াও শিক্ষকদের প্রাক-চাকুরী যোগ্যতা ও দক্ষতা নির্ধারণ, মানদণ্ড তৈরির মাধ্যমে সুস্পষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণ এবং কৌশল নির্ধারণ করে শিক্ষকদের ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে তোলা প্রয়োজন।
- শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের জন্যও শিক্ষাক্রমের ধারণায়ন, কৌশল, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন যেন তারা বিদ্যালয়কে কার্যকর সহায়তা দিতে পারে। তাছাড়া পরিকল্পিতভাবে যথাযথ একাডেমিক উদ্যোগ এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থায়ী শিক্ষা প্রশাসন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- কার্যকর মনিটরিং ও মেন্টরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে একটি বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন।
- ব্যক্তি নিরপেক্ষ/ নৈর্ব্যক্তিক শিখনকালীন মূল্যায়ন কাঠামো ও ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা জরুরী। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ক্ষমতায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে একটি বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন।
- শিক্ষাক্রমের দর্শন, ধারণায়ন, কৌশল, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সাথে উচ্চশিক্ষা ও এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন, যেমন ভর্তি প্রক্রিয়া, বিষয়, শিক্ষাক্রম, আন্তঃবিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও সংযোগ ইত্যাদি।
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ছাড়াও বাস্তবায়নে এনসিটিবির ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন, যেন শিক্ষাক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায়। এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, পরিবর্ধন, পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা না করে যাতে প্রতিনিয়ত এ কাজ চলমান রাখা যায়। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং, মূল্যায়ন, গবেষণা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জন একুশ শতকের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যার জন্য পেশাদার, দক্ষ বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন।
- বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে **বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ মহাপরিকল্পনা** প্রণয়ন ও তার সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সঠিক ও সতর্কতার সঙ্গে কারিগরি ধাপসমূহ অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে না করলে কার্যকর ফলাফল প্রাপ্তির চেয়ে বাস্তবায়ন দূর্যোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না।
- শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ সকল অংশীজনের সক্রিয় সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য **সমন্বিত গণযোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন** করা প্রয়োজন। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ বাস্তবায়ন বাধা সহজেই দূরীভূত করে ফলে কার্যকর ফলাফল দ্রুত অর্জন করা যায়।

গ) নীতি ও পরিকল্পনা

শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি নির্দেশনার পরিমার্জন যেমন প্রয়োজন হতে পারে তেমনি নতুন নির্দেশনারও প্রয়োজন হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, অর্থায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্দেশনার সুযোগ রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হলো:

- শিক্ষাক্রম রূপরেখায় বর্ণিত পরিবর্তন ও পরিমার্জনসমূহ শিক্ষাব্যবস্থাসহ সকল পর্যায়ের অংশীজনের যথাযথভাবে অনুধাবন, প্রযোজ্য স্থানে প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশনা, কৌশল, পরিকল্পনা ও অর্থায়ন
- শিক্ষাব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দক্ষতা, ক্ষমতায়ন ও অর্থায়নের উদ্যোগ
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীজনদের সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্যে সম্পৃক্তকরণ যেন পুরো ব্যবস্থার পারদর্শিতা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া যায়।
- শিক্ষায় টেকনোলজির ব্যবহার এবং তার সহজ প্রাপ্তি ও ব্যবহারে প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশনা প্রণয়ন।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

ACARA (2020), *Australian Curriculum*. Australian curriculum assessment and reporting authority

ACARA (2010). *Information and Communication Technology (ICT) competence.* Retrived from http://consultation.australiancurriculum.edu.au/GeneralCapabilities/ICT/ConceptualStatement

Adam, S. (2004). *Using Learning Outcomes: A consideration of the nature, role, application and implications for European education of employing learning outcomes at the local, national and international levels.* Bologna: United Kingdom.

Ahsan, M. T., Sharma, U., Deppeler, J. (2012) Challenges to prepare pre-service teachers for inclusive education in Bangladesh: beliefs of higher educational institutional heads. *Asia Pacific Journal of Education (APJE), 32*(2); 1-17. Available at: DOI: 10.1080/02188791.2012.655372

Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? *Journal of Educational Change* 6: 109-124.

Ajzen, Icek (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50*(2), 179–211.

Albrecht, K. (2004). *Social Intilligence theory.* K A International

Asian Centre for Inclusive Education-ACIE (2017). *Inclusive Education Working Paper Series 1: Redefining the Concept and Actions for Inclusive Education*. Dhaka: ACIE.

Basic Education. (2020). Retrieved from https://www.oph.fi/en/education-system/basic-education

BCSEA. (2019). *National Education Assessment Framework 2019*. Bcsea-RGB

Benchmarks Online ~ Project 2061 ~ AAAS. (2020). Retrieved from http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?home=true

Brolpito, A. (2018). *Digital skills and competence, and digital and online learning*. ETF

Brookings. (2016). *Brookings Annual Report*. Washington DC: The Brookings Institution. Retrieved from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/12/2016-annualreport.pdf

Brown, R.B. (1994). Refrain the competency debate: Reframing the competency debate: management knowledge and meta-competence in graduate education. Sage journals, 25(2), 289-99.

doi.org/10.1177/1350507694252008

Building Student Success - BC's New Curriculum. (2020). Retrieved from https://curriculum.gov.bc.ca/

Care, E. (2020). *Optimizing assessment for all: Assessment as a Stimulus for Scaling 21st Century Skills in Education Systems.* Brookings

CDC, (2013). *Zambia Education Curriculum Framework*. MOESVTEE, Zambia.

Cheng, K. & Jackson, L. (2017). *Advancing 21 century competencies in Hong Kong*. Asia Society.

Commonwealth of Australia, (2005). *National Framework for Values Education in Australian Schools.* DEST, Australian Government.

Curiculum for excellence – Religious and moral education -Principles and practice. Retrived from www.curriculumforexcellencescotland.gov.uk

Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare (revised 2018). (2020). Retrieved 1 November 2020, from https://www.skolverket.se/publikationer?id=3984

Department of Education (2014). *National Curriculum standards and Benchmark Mathmatics Grade I t0 XII*. Department of Education FSM

Department of Education, Government of Pakistan. (1959). *National Education Commission Report.* Dhaka: Government of Pakistan Press.

DPE (2011). *Third primary education development programme (PEDP3): Main document*. Dhaka: DPE.

ECTS Users' Guide. (2009).Retrieved December 6, 2020, from https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf

Education - OECD. (2020). Retrieved from https://www.oecd.org/education/

Estonia, Government of the Republic. (2014). *National Curriculum for Upper Secondary School, Regulation*, Tallinn: Estonia, Government of the Republic

F-10 curriculum. (2020). Retrieved from https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/

Fosnot, C. T. (1996). *Constructivism: Theory, perspectives and practice*. NY: Teahers College Press.

Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Duckworth, D., Friedman, T (2018). *Computer and information literacy Assessment Framework*. IEA-ICILS

Future of Education and Skills 2030 – OECD. (2020). Retrieved from https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/

Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books.

Glaesser, J. (2019). Competence in educational theory and practice: a critical discussion, Oxford Review of Education, *Research Gate*, 45(1), 1-16. DOI:10.1080/03054985.2018.1493987

Government of the People's Republic of Bangladesh. (1974). *Bangladesh Education Commission Report.* Dhaka: Bangladesh Government Press.

Grayson, H., Heron, M., O'Donnell, S., Sargent, C., Sturman, L., Taylor, A. (2014). *Education about Religions and Beliefs and Ethics in Primary Education*. NFER

Great Schools Partnership (2020). *Ten principles of competency-based learning* retrieved from https://www.greatschoolspartnership.org/wp-content/uploads/2017/01/GSP_Ten_Principles_of_CBL.pdf

Gromada, A. & Shewbridge, C. (2016) *Student Learning Time: A literature review.* OECD - Education working paper -127

Herman, B. & Collins, R. (2018). *Social and Emotional Learning Competencie.* Wisconsin Department of Public Instruction

HETAC (2006): *Explanatory Guidelines on the Direct Application to HETAC for a Named Award*, Dublin: Higher Education and Training Awards Council.

Hwb. (2019). *Health and Well-being* retrived from https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/health-and-well-being/

IBE UNESCO. (2017). *Prototype of a national curriculum framework*. IBE-UNESCO

Innovation Unit, Aga Khan Education Services and the Aga Khan Foundation (2018) *Raising Learning Outcomes: the opportunities and challenges of ICT for learning.* UNICEF Eastern and Southern Africa Regional Office and West and Central Regional Office, Nairobi.

Ioannidou, F. & Konstantikaki, V. (2008). *Empathy and emotional intelligence: What is it really about?* International Journal of Caring Sciences, 1(3):118–123

Islam, S., Miah, S. (Eds.). (2012). *Banglapedia: the National Encyclopedia of Bangladesh* (2nd ed., vols. 1-14). Dhaka: Banlapedia Trust, Bangladesh Asiatic Society.

Kabita, D. & Ji, L. (2017). *The Why, What and How of Competency-Based Curriculum Reforms: The Kenyan Experience*. IBE-UNESCO

Kennedy, D. & Hyland, A. (2009). Learning outcomes and competencies. Research Gate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/285264101

KICD (2017). *Basic Education Curriculum Framework*. KICD-Kenya

Levine, E. & Patrick, S. (2019). *What is competency-based education? An updated definition.* Vienna, VA: Aurora Institute.

Lewin, L., McNicol, S. (). *Supporting the Development of 21st Century Skills through ICT.* Manchester Metropolitan University

Matavire, M., Mpofu, V. & Maveneka, A. (2013). Streaming Practices and Implications in the Education System: A Survey of Mazowe District, Zimbabwe, *Journal of Social Science for Policy Implications, American Research Institute for Policy Development, 11,* 60-70. Retrieved from http://jsspi.com/journals/jsspi/Vol_1_No_1_June_2013/6.pdf

Matthes, M. Pulkkinen, L. Clouder, C. Heys, B (2018). *Improving the Quality of Childhood in Europe.* Alliance for Childhood European Network Foundation, Brussels, Belgium

McMaster University (2018). *Fostering K-12 Students' Global Competencies*. Forum+

Miller, C, Hoggan, J., Pringle, S. and West, C. (1988): Credit Where Credit's Due. Report of the Accreditation of Work-based Learning Project. Glasgow.SCOTVEC.

Ministry of Education, Namibia (2016). *National Curriculum for Basic Education.* NIED-MOE

Ministry of Law and Parliamentary Affairs (2013). *The Rights and Protection of Person's with Disability Act, 2013*. Dhaka: BG Press.

Ministry of Law and Parliamentary Affairs (2013a). *The Protection Trust for the Person's with Neuro-Developmental Disabilities Act, 2013*. Dhaka: BG Press.

National curricula 2014 | *Estonian Ministry of Education and Research*. (2020). Retrieved from https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014

National Curriculum and Textbook Board. (2019). *Effectiveness, Situation Analysis and Needs Assessment of Current Pre-Primary and Primary Curriculum of Bangladesh: A Compilation of Key Findings*.

National Curriculum and Textbook Board, Secondary Education Sector Investment Program (SESIPII) (2019). *2019 Curriculum Review- Review of 2012 Secondary Education Curriculum.*

National Research Council. (2012). *A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas*. National Academies Press.

NCERT. (2017). *Curricula for ICT in Education*. NECRT

Neary, M. (2002). *Curriculum studies in post-compulsory and adult education*. Cheltenham: Nelson Thornes.

Norris, N. (1991). The trouble with competence. *Cambridge Journal of Education, 21*(3), 331–341.

OECD. (2020). *Learning Framework 2030*. Author. Retrieved from http://www.oecd.org/education/2030/learning-framework-2030.htm/

Ogwora et al. (2013). Philosophy as a key instrument in establishing curriculum, educational policy, objectives, goals of education, vision and mission of education. *Journal of Education and Practice, 4*(11), 95-101.

Palade, Eugen. UNICEF, (2019). *Status of Curriculum Development and Implementation in Bangladesh. A Rapid Review*.

PISA 2021: Mathematics Framework. (2020). Retrieved from https://pisa2021-maths.oecd.org/

PISA 2021: ICT Framework (2020). Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-ICT-Framework.pdf

PISA (2018) *Preparing our youth for an inclusive and sustainable world The OECD PISA global competence framework*. OECD

Pre-school Education Unit (2020). *Nurturing Early Learners – A Framework For A Kindergarten Curriculum In Singapore.* Ministry of Education, Singapore.

QAA. (2014). *Subject benchmark statement – Theology and religious study*. QAA

Quebec Education Program. (2011). *Progression of Learning in Secondary School-Ethics and Religious Culture.* QEP

Richardson, V. (1997). *Constructivist teacher education*. London: The Falmer Press.

Schols, M. & Bottema, J. (2014). *A National ICT Competency Framework for Student Teachers.* ResearchGate

SCSA (2017). *Health and Physical Education*. School curriculum and standards authority, Western Australia.

SEAMEO (2012). *K to 12 Toolkit*. *Philippines* SEAMEO INNOTECH

Shukhnandan, L. & Lee, B. (1998). Streaming, setting and grouping by ability: *A review of the literature.* Berkshire: The national foundation for educational research.

Siemens, G. (2004). *Connectivism: A learning theory for the digital age.* Retrieved from http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm

Singh, G. & Singh D. K. (2018). A Comparative Study of Self Concept of XI Class Students of Commerce and Science Stream, *Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*, 5(25). Retrieved from http://www.srjis.com/pages/pdfFiles/15178214966%20Geeta%20Singh.pdf

Stabback, P. (2016). *What Makes a Quality Curriculum?* IBE-UNESCO

Steffe, L. P., & Gale, J. (Eds.). (1995). *Constructivism in education*. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

The Digital Competence Framework 2.0 - EU Science Hub - European Commission. (2020). Retrieved from https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

The Economist. (2018). *Worldwide educationg for the future index 2018*. The Economist intelligence unit.

UN Enable (2008). *Convention on Rights of Persons with Disabilities*. Retrieved September 17, 2020, from http://www..un.org/esa/socdev/enable//documents/tccconve.pdf

UNESCO. (2016). *UNESCO strategy on Education for Health and Well-being.* UNESCO

UNESCO (2018) *UNESCO ICT Competency Framework for Teachers*. UNESCO.

Valencia, T., Serna-Collazos, A., Ochoa-Angrino, S., María Caicedo-Tamayo, A., Andrés Montes-González, J., David Chávez-Vescance, J. (2016) *ICT standards and competencies from the pedagogical dimension: A perspective from levels of ICT adoption in teachers' education practice*. Pontificia Universidad Javeriana

Van der Klink, M and Boon, J. (2002). Competencies: The triumph of a fuzzy concept. *International Journal of Human Resources Development and Management, 3*(2), 125 – 137.

Vitikka, E. & Krokfors, L. & Hurmerinta, H. (2012). *The Finnish National core curriculum: Structure and Development.*

WEF (2014). *What's The Difference Between ICT Capabilities & the Digital Technologies Learning Area?* Retrived from https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/systems-thinking

Winterton, J., Delamare, F. & Stringfellow, E. (2005). Typology of knowledge, skills and competences: Clarification of the concept and prototype. *Research Gate.* Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/265082356_Typology_of_Knowledge_Skills_and_Competences_Clarification_of_the_Concept_and_Prototype

Whitty, G., & Willmott, E. (1991). Competence-based teacher education: Approaches and issues. *Cambridge Journal of Education, 21*(3), 309–318

World Economic Forum (2020). *School of the future- Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution.* WEF

World Economic Forum (2015). *New Vision for Education - Unlocking the Potential of Technology*. WEF

World Economic Forum (2014). *Education and Skills 2.0.*

কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট উইং, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ (২০১৯). *মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা, বাস্তবায়নের বাস্তব অবস্থা যাচাই ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা ২০১৯*

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ (১৯৯১). *সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন ও নবায়ন- আবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক শিক্ষা)*

সূচনা ফাউন্ডেশন (২০১৯)। *বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর শিখন-শিক্ষন কৌশলঃ শিক্ষা-পেশাজিবিদের জন্য ট্রেনিং ম্যানুয়াল*। ঢাকাঃ সূচনা ফাউন্ডেশন।